ব্যবহার থাকিলেও, "অভাব" বুঝাইবার জন্য যে কয়েকটি অত্যাবশ্যক শব্দ আছে, তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। যাহার অভাব, তাহাকে "প্রতিযোগী" বলে; যেমন "ঘটের অভাব", এস্থলে এই ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট। যে অধিকরণে অভাব থাকে, তাহাকে বলে "অনুযোগী"। যেমন ঘটাভাবের অনুযোগী এই গৃহ। "অবচ্ছেদক" কাহাকে বলে, "অবচ্ছিন্ন" কাহাকে বলে, অভাব বুঝাইতে হইলে এই দুইটি শব্দেরও পারিভাষিক অর্থ বুঝান উচিত ছিল; এই "অবচ্ছেদকতা" বুঝাইতে যাইয়া "অবচ্ছেদকতা নিরুক্তি" গ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং সে আশা পরিত্যক্ত হইল, উপস্থিত ক্ষেত্রে সেই সেই স্থলে সহজে যতটুকু পারি, বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

এস্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, ঘট হইতে যেমন পট ভিন্ন, তেমনি ঘটাভাব হইতেও পটাভাব ভিন্ন। কারণ ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট, পটাভাবের প্রতিযোগী পট, এই প্রতিযোগীর ভেদ দ্বারা অভাবের ভেদ হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক সম্বন্ধে ঘট থাকিলেও অপর সম্বন্ধে ঘটাভাব হইতে পারে। এক সম্বন্ধে ঘট থাকিলেও অপর সম্বন্ধে ঘটাভাব হইতে পারে; ইহার অর্থ কি? অর্থ একটু বি..দ করিয়া বুঝাইতে হইবে। প্রত্যেক পদার্থই সেই সেই পদার্থের অধিকরণ এক একটি সম্বন্ধে অবস্থিত। আমি যে এই আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছি, আমারও আসনের সহিত একটি সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধটি অন্য নয়, সেটি সংযোগ। এই সংযোগ সম্বন্ধটি আমার অবস্থিতির নিয়ামক, সুতরাং আমার অবস্থিতি সংযোগ সম্বন্ধ দ্বারা নিয়মিত, সুতরাং আমিও সেই সংযোগ সম্বন্ধ দ্বারা নিয়মিত, অবস্থিতি বিশিষ্ট, কাজে কাজে অন্য আমি হইতে এই [illegible], ও ঈদৃশ আমার অভাব অন্য আমার অভাব হইতে ভিন্ন। "অন্যোন্যাভাব" কি বুঝাইবার জন্যই এত কথা বলিলাম। সংযোগ সম্বন্ধ প্রভৃতির ন্যায় "তাদাত্ম্যসম্বন্ধ" নামে একটি সম্বন্ধ আছে। তাদাত্ম্য অর্থ তদাত্মতা, তদাত্মতা অর্থ তৎস্বরূপ বলিলেও হয়। নৈয়ায়িকগণ "স্বরূপ সম্বন্ধ" বলিয়া একটি পৃথক্ সম্বন্ধের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই জন্য "তাদাত্ম্যকে" ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ হইয়া ন্যায়শাস্ত্রের পরিভাষানুসারে "স্বরূপ" বলা যাইতে পারে না। প্রত্যেক পদার্থ সেই সেই পদার্থের তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অবস্থিত। ঘট, ঘটে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে রহিয়াছে। পট, পটে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে রহিয়াছে। এইস্থলে আরও একটু বলা আবশ্যক। ঘটে যেমন ঘটত্ব আছে বলিয়া ঘট ঘট হইয়াছে, এই ঘটত্ব আছে বলিয়াই ঘট পট প্রভৃতি হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইতেছে, সেইরূপ

ঘটাভাব প্রতিযোগীও তাহাতে ঘটাভাব প্রতিযোগিত্ব আছে বলিয়া তাদৃশ প্রতিযোগী হইয়াছে, এই প্রতিযোগিত্ব আছে বলিয়াই অন্য হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইতেছে। আবার শুক্লঘট যেমন ঘট ভিন্ন পদার্থ হইতে এবং সজাতীয় পীত ঘটাদি হইতে ভিন্ন, সেইরূপ সংযোগসম্বন্ধ বিশিষ্ট ঘটাভাবপ্রতিযোগী সমবায়-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ঘটাভাবপ্রতিযোগী হইতে ভিন্ন। ইহার তাৎপর্য্য, শুক্লঘটে যে শুক্লত্ব আছে, সেই শুক্লত্বটি ঘটত্বের অবচ্ছেদক, ভেদক ও নিয়ামক। এই শুক্লত্ব দ্বারা ঘটত্ব অবচ্ছিন্ন, নিয়মিত। প্রতিযোগীতে যে প্রতিযোগিতা রহিয়াছে, সম্বন্ধ (সংযোগাদি) তাহার অবচ্ছেদক, ভেদক ও নিয়ামক। এই সম্বন্ধ দ্বারা প্রতিযোগিতা অবচ্ছিন্ন, নিয়মিত। সুতরাং ঘট সত্ত্বেও আমরা কোন এক অনুগত সম্বন্ধ দ্বারা নিয়মিত প্রতিযোগিতাশালী ঘটাভাবের অনুভব করিতে পারি। অত্যন্তাভাবস্থলে প্রতিযোগী তাহার অধিকরণে নানা সম্বন্ধে থাকিতে পারে; সুতরাং সেই সেই সম্বন্ধ তাহার প্রতিযোগিতার নিয়ামক হইতে পারে। অন্যোন্যাভাবের উদাহরণ ঘট পট নয়, অর্থ—ঘটে পটের অভাব আছে, পটের ভেদ আছে, পটে পট তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অবস্থিত, সুতরাং এই তাদাত্ম্যসম্বন্ধই এই পট ভেদ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক, ভেদক, নিয়ামক। যে স্থলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ প্রতিযোগিতার ভেদক হইবে, সেই স্থলে অন্যোন্যাভাব হইবে। নৈয়ায়িকগণ তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবকেই অন্যোন্যাভাব বলিয়াছেন, সেইটিই তাদৃশ অভাবত্বই অন্যোন্যাভাবের লক্ষণ (Definition)। অন্যোন্যাভাব কি, বুঝাইবার জন্য অনেক কথা বলিলাম, বুঝাইতে পারিয়াছি কি না বলিতে পারি না। দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকে অভাব স্বীকার করেন না, তাঁহারা অভাবকে সেই অভাবের অধিকরণ স্বরূপ বলেন। বিনাযুক্তিতে দার্শনিকগণ কখনই অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করিতে সম্মত হয়েন না, তাঁহারা স্বীকৃত পদার্থের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করিতে পারিলেই কৃতার্থ হয়েন।

অভাব অধিকরণ স্বরূপ, ইহার তাৎপর্য্য এই,এই ভূতলে ঘট নাই, ইহার অর্থ এই ভূতল বিশুদ্ধ ভূতল, ঘট থাকিলে ঘটযুক্ত বা ঘটাধিকরণ ভূতল হইত, ভূতলে একটি বিশেষণ সম্বন্ধ থাকিত, তাহা যখন নাই, তখন যে ভূতল সেই ভূতলই রহিয়াছে। অভাবও যা, অভাবের অধিকরণ ভূতলও তাই, সুতরাং অভাব নামে একটি অতিরিক্ত পদার্থের স্বীকার করিয়া পদার্থ শ্রেণীর সংখ্যা বাড়াইবার প্রয়োজন কি? কেবল গৌরবের আশ্রয় গ্রহণ করা ভিন্ন আর কিছুই প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার উত্তরে মনীষাসম্পন্ন নৈয়ায়িকগণ বলেন,

অধিকরণ স্বরূপ বলিয়া অভাব পদার্থকে উড়াইবার সম্ভাবনা নাই, প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ অভাব খণ্ডনে একান্ততঃ যুক্তির অভাব, অভাব স্বীকারে যুক্তি তর্কের অভাব নাই, তুমি একটি পুষ্প গ্রহণ করিয়া হস্তে ঘুরাইতেছ, সেই পুষ্পটির বাহ্য সৌন্দর্য্যে অবশ্য চক্ষুঃ মোহিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সেই বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া, বাহ্যরূপ দেখিয়া আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে সৌগন্ধের সদ্ভাব আছে কি না? তুমি তখন তাহার সৌগন্ধ জানিবার জন্য তাহাতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংযোগ করিবে ও করিয়া যদি সৌগন্ধ থাকে বুঝিতে পার, বলিবে,—হাঁ, ইহাতে সৌগন্ধ আছে, আর যদি সৌগন্ধ নাই বুঝিতে পার, তৎক্ষণাৎ বলিবে—না. ইহাতে সৌগন্ধ নাই। এক্ষণে ইহা দ্বারা কি বুঝিলে? অভাব যদি অধিকরণ স্বরূপ হইত, তবে তুমি যে ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই সৌরভাভাবের অধিকরণ পুষ্পের উপলব্ধি করিয়াছ, সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা (চক্ষুঃ দ্বারা) সৌরভাভাবেরও উপলব্ধি করিতে পারিতে, তাহা যখন পারিলে না, তখন কি করিয়া বলিব অভাব অধিকরণ স্বরূপ? ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা পুষ্পের প্রত্যক্ষ হয় না, অথচ পুষ্পে যে সৌগন্ধের অভাব আছে, তাহার প্রত্যক্ষ হইতেছে; ইহাদ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে, অভাব অধিকরণস্বরূপ নয়, অভাব স্বতন্ত্র পদার্থ। অভাব ও অধিকরণ এক হইলে এক ইন্দ্রিয় দ্বারাতেই এই অভিন্ন পদার্থদ্বয়ের জ্ঞান হইত, অভাব ও অধিকরণ এক হইলে এই অভিন্ন-পদার্থদ্বয়ের যুগপৎ জ্ঞান হইত, এই অভিন্ন পদার্থদ্বয় এক জ্ঞানের বিষয় হইত, তাহা যখন হয় না, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও অভাবকে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ বলিতে হইবে। নৈয়ায়িকগণ অভাবকে একটি অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেও প্রত্যেক পদার্থের উপরে শক্তি নামে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করেন না। শক্তি স্বীকারে শক্তিবাদীরা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, বহ্নিতে দাহিকাশক্তি আছে কি না? নাই বলিলে তোমাদিগের গত্যন্তর নাই, আমরা দেখাইয়া দিতে পারি, বহ্নি দাহের কারণ নয়, বহ্নিতে দাহিকাশক্তি নামে একটি শক্তি আছে, সেইটি দাহের প্রতিকারণ। বহ্নি যদি দাহের কারণ হইত, তাহা হইলে সকল সময়ে সকল অবস্থাতে বহ্নি সংযোগ হইলে দাহ নিষ্পন্ন হইত। যাহারা চড়ক পূজার সময়ে প্রোজ্জ্বলিত বহ্নিকুণ্ডের উপরিভাগে উন্মুক্ত কেশপাশ অধঃশিরাঃ রজ্জুবদ্ধউর্দ্ধপদ সন্ন্যাসীর আন্দোলন দেখিয়াছে, আর দেখিয়াছে, সেই বহ্নিকুণ্ডে পুনঃপুন ঘৃত ধারানিঃক্ষেপ ও সর্জ্জরসনিঃক্ষেপ সেই প্রবল বহ্নির প্রবল পরাক্রম, তাহারা কখনই বলিতে পারে না, বহ্নি দাহের কারণ; যাহারা দেখিয়াছে

বারাণসীর পবিত্র বক্ষে জঙ্গম সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত হোম, ও জ্বলন্ত অঙ্গারের উপরিভাগে জঙ্গমগুরুর নগ্নপদে বিচরণ, তাহারা কখনই বলিতে পারে না, বহ্নি দাহের কারণ। বহ্নি দাহের কারণ হইলে, বহ্নির সদ্ভাব আছে; সুতরাং সন্ন্যাসী দগ্ধ হইয়া যাইত, জঙ্গমগুরু দগ্ধপদ হইয়া নিজের বুজরুকির পরিহার করিতেন। এই জন্য বলিতে হইবে, বহ্নি দাহের কারণ নয়, বহ্নির দাহিকাশক্তিই দাহের কারণ, কোনরূপ ঔষধ সংযোগে সেই শক্তির বিনাশ বা ব্যাঘাত হয়, সেই জন্য বহ্নিসত্ত্বেও বহ্নি-সংযোগেও দাহ জন্মে না। মহর্ষি জৈমিনির শিষ্যবৃন্দের মত নিউটন প্রভৃতি য়ুরোপীয় আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও এই মতের অনুবর্ত্তী। নৈয়ায়িকগণ হাসিয়া বলেন, এ তোমার কিরূপ কল্পনা, বুঝি না। ঔষধ সংযোগে যদি শক্তির বিনাশ হইত, তবে সেই ঔষধের অপসারণ করিলে আবার দাহ হয় কি করিয়া? বলিবে, আবার দাহিকাশক্তির উৎপত্তি হয়,—উৎপত্তি হয়, কি করিয়া? যাহার উৎপত্তি হয়, তাহার উৎপাদক কারণ চাই, এস্থলে শক্তি উৎপাদক কারণ কি? কারণ ভিন্ন কখনই কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। যাহার বিনাশ আছে, উৎপত্তি আছে, সে কার্য্য; সুতরাং তাহার কারণের আবশ্যক। যদি বল, শক্তির বিনাশ হয় না, শক্তির ব্যাঘাত হয়, শক্তি ব্যাহত হয়, কুণ্ঠিত হয়, তাহা হইলে, আর অতিরিক্ত শক্তি কল্পনার প্রয়োজন কি? বহ্নিই সেই সেই ঔষধ সংযোগে ব্যাহত হয়, কুণ্ঠিত হয় বলিলেই ত কার্য্য কারণ ভাবের উপপত্তি হয়। প্রসঙ্গস্থলে একটী গল্পের অবতারণা করা গেল,—

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাসাদান্তঃপুরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে একদিন অপরাহ্ণে অন্তঃপুরচারিণী মহিলাদিগের সহিত রাজমহিষী উপবিষ্টা ছিলেন; ঠিক সেই সময়ে খঞ্জনী হস্তে একটি যুবতী বৈষ্ণবী আসিয়া মহারাণীকে হাস্যমুখে বলিল, "রাণীমা, আমি খঞ্জনীতে অতি সুন্দর তাল বাজাইতে পারি ও সেই সঙ্গে রাগ রাগিণী সমন্বিত গান গাইতে পারি, আপনাকে শুনাইবার জন্য এখানে আসিয়াছি।" বৈষ্ণবীর হাব, ভাব, হস্তচালনা ও নেত্রচালনা দেখিয়া ও তাহার সেইরূপ কথা শুনিয়া কোন কোন মাননীয়া অন্তঃচারিণী কহিলেন, "কিগো, তুমি কেমন মেয়ে মানুষ! মেয়ে মানুষ আবার তান বাজাইতে পারে ও রাগ আলাপ করিতে পারে?" বৈষ্ণবী কহিল, "হাঁ, আমি পারি, পারি কিনা একবার দেখুন"। রাজমহিষীর প্রগল্‌ভা পরিচারিকা মাধবী সেই স্থানে উপস্থিত ছিল, সে বলিয়া উঠিল, "তুই মাগী, কখনই বাজাইতে পারিস্ না,

বাজা দেখি, আমার সম্মুখে কি করিয়া পারিস্‌”, বৈষ্ণবী একটু হাসিয়া বামহস্তে খঞ্জনী ধরিল ও দক্ষিণ হস্তের কমনীয় অঙ্গুলিগুলি তাহাতে ন্যস্ত করিল। আর কোথায় যায়? তৎক্ষণাৎ বলবতী মাধবী সবলে তাহার হস্ত চাপিয়া ধরিল ও বলিল, “বাজা ছুঁড়ী, বাজা, তোর বড়ই ধাষ্টামি, আজ তোর ধাষ্টামি ভাঙ্গিয়া দিতেছি।” বৈষ্ণবী হাত নাড়িতে পারিল না—তাহার খঞ্জনী বাজা বন্ধ হইল। অন্তঃপুরচারিণীদিগের হাস্যতরঙ্গে সেই অন্তঃপুর কম্পিত হইয়া উঠিল। মহিষীর আজ্ঞায় মাধবী বৈষ্ণবীর হস্ত ত্যাগ করিল, বৈষ্ণবী তখন খঞ্জনীতে দুই একবার অঙ্গুলী চালনা করিয়া তাহার সেই শিক্ষিত হস্ত একটি বিশুদ্ধ তাল বাজাইতে বাজাইতে দ্রুত অঙ্গুলী চালনায় পরণ তুলিয়া তাহার শিক্ষানৈপুণ্য দেখাইতে লাগিল। রমণী সমাজ কি বুঝিবে? সে স্থলে কোন ভাল বাদক ছিল না, কোন সঙ্গীতজ্ঞ কালওয়াত ছিল না, যে বৈষ্ণবীর সেই বাদনে মোহিত হইয়া বৈষ্ণবীকে ধন্যবাদ করিবে, কোন মীমাংসক পণ্ডিত ছিলেন না বা কোন নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন না যে, মাধবী কর্ত্তৃক ধৃত-হস্তা বৈষ্ণবী পূর্ব্বেই বা কেন বাজাইতে পারিল না, পরেই কেন বাজাইতে পারিল, তাহার তত্ত্বনির্ণয় করিবেন। সে সময়ে সে স্থলে মীমাংসক বা নৈয়ায়িক উপস্থিত থাকুন বা না থাকুন, আজ কিন্তু আমি সেই কথার অবতারণা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, ধৃতহস্তা বৈষ্ণবী কেন বাজাইতে পারিল না, আবার মুক্তহস্তা বৈষ্ণবীই বা কেন বাজাইতে পারিল? একি শক্তির ধ্বংস বা শক্তি সঙ্কোচন? যেমন কার্য্য কারণ ভাব আছে, সেইরূপ প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধকভাব আছে। কারণ সত্ত্বে নিশ্চয় কার্য্য উৎপন্ন হয়, যদি তাহার প্রতিবন্ধক না থাকে। প্রতিবন্ধক থাকিলে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। কার্য্য বিশেষে যেমন কারণ বিশেষ অনুগত; সেইরূপ বিশেষ বিশেষ কার্য্যে বিশেষ বিশেষ প্রতিবন্ধক অনুগত আছে। বৈষ্ণবীর হস্ত খঞ্জনীবাদনের কারণ; কিন্তু মাধবীর সবল হস্তের অবরোধ তাহার প্রতিবন্ধক। যতকাল এই প্রতিবন্ধক ছিল, ততকাল খঞ্জনী-বাদন হয় নাই, যখন প্রতিবন্ধকের অভাব হইয়াছে, আর খঞ্জনীতে বৈষ্ণবীহস্তের আঘাত হইয়াছে, অমনি খঞ্জনী বাদিত হইয়াছে। সেইজন্য বলিতে হইবে, একটি মাত্র কারণে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, যে যে কার্য্যে যতটি কারণের আবশ্যক আছে, সেই সমস্ত কারণেরই সদ্ভাবের প্রয়োজন। কারণ, সামগ্রীর মধ্যে প্রতিবন্ধকাভাবও একটি অন্তর্নিবিষ্ট, কার্য্যোৎপত্তির প্রতি যেমন ভাব কারণ আছে, কার্য্যোৎপত্তির প্রতি অভাব ও সেইরূপ কারণ আছে। বোগ

ধ্বংসে স্বাস্থ্য জন্মে, আনন্দ উৎপন্ন হয়, শত্রুবিনাশে আনন্দ ও পুত্রনাশে দুঃখের উৎপত্তি হয়। সুতরাং ভাবের ন্যায় কার্য্য বিশেষের প্রতি অভাব কারণ। অভাব যখন কারণ শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে, তখন আর শক্তি স্বীকারে প্রয়োজন কি? সেই সেই কার্য্যের প্রতি প্রতিবন্ধকাভাব বিশিষ্ট সেই সেই পদার্থই কারণ বলিলেই সিদ্ধান্ত হইতে পারে। বহ্নি দাহের প্রতিকারণ, ঔষধ প্রভৃতি দাহের প্রতিবন্ধক, বহ্নির মত দাহের প্রতি এই প্রতিবন্ধকাভাবও একটি কারণ; সুতরাং বলা আবশ্যক, দাহের প্রতি প্রতিবন্ধকাভাব বিশিষ্ট বহ্নিই কারণ। দর্শনশাস্ত্রের নিয়মানুসারে পদার্থমাত্রেরই উদ্দেশ, লক্ষণ, পরীক্ষা প্রদর্শন করিতে হয়। আমি যথামতি অভাব সম্বন্ধে তৎসমস্ত প্রদর্শন করিয়াছি ও প্রসঙ্গতঃ শক্তি খণ্ডনের যুক্তি তর্ক দেখাইয়াছি। এক্ষণে ইচ্ছা করিলে আমি এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারি; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের পাঠক পাঠিকা ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন না, সেই জন্য বারান্তরে অভাব বিষয়ক একটি ইতিবৃত্ত প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা রহিল।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

রত্নমালা।

(১৩)

সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বথা।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥

ভাবার্থ—দীন-হীন-জনে দয়া, সত্যব্রত,—আর
কামক্রোধ আদি রিপু বশীভূত যা'র,
ত্রিলোক বিজয়ী হন সেই মহাশয়;
শাস্ত্রের বচন ইহা;—নাহিক সংশয়॥

(১৪)

নিন্দাং যঃ কুরুতে সাধোস্তথা স্বয়ং দূষয়ত্যসৌ।
যো ধূলিং যস্ত্যজেদ্ দুষ্টো মূর্দ্ধি তস্যৈব সা পতেৎ॥

ভাবার্থ—সাধুজনে নিন্দাবাদ করে যেই জন,
দূষিত সে করে তাহে চরিত্র আপন।
যে দুষ্ট উড়ায় ধূলি, দিতে নভঃ-গায়,
সে ধূলি পতিত হয় তাহারই মাথায়॥

(১৫)

ঊর্জ্জিতং সজ্জনং দৃষ্ট্বা দ্বেষ্টি নীচঃ পুনঃ পুনঃ।

ভাবার্থ—সজ্জন-উন্নতি নীচে সহিতে না পারে।
পর-সুখ হেরি' পুনঃ পুনঃ হিংসা করে॥

(১৬)

নাস্তি সত্য সমো ধর্ম্মো ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।
ন হি তীব্রতরং কিঞ্চিদ নৃতাদিহ বিদ্যতে॥

ভাবার্থ—সত্য-সম ধর্ম্ম, কিংবা শ্রেষ্ঠ ইহা হ'তে,
অপর কিছুই আর নাহি এ জগতে।
মিথ্যার সমান তীব্র নাহি কিছু আর ;
অতএব যত্নে কর মিথ্যা পরিহার।

(১৭)

নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
ছিন্নঃ কুশাগ্রমাত্রেণ প্রাপ্ত কালো জীবতি॥

ভাবার্থ—শত শরাঘাতে কেহ না মরে অকালে।
ছিন্ন কুশাগ্রেও মরে কাল পূর্ণ হ'লে॥

একটী নূতন প্রস্তাব।

মহাভারত হিন্দুদিগের অতীব পবিত্র গ্রন্থ। হিন্দুমাত্রেই মহাভারতের আদর ও সম্মান করেন। করিবার যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান আছে। যাঁহারা শাস্ত্রপ্রিয়, শাস্ত্রানুশীলন বা শাস্ত্রচর্চ্চা করেন, তাঁহাদের নিকট ইহা অত্যধিক আদরের সামগ্রী। কেননা মহাভারতে সমুদায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বা রহস্য সংকলিত আছে। যাঁহারা কাব্যপ্রিয়—কাব্য ভালবাসেন, তাঁহাদেরও নিকট মহাভারত সমাদর প্রাপ্ত। কেননা ইহাতে কাব্যরসেরও পরাকাষ্ঠা সন্নিহিত আছে। যাঁহারা গল্পপ্রিয়—গল্প শুনিতে ভালবাসেন, তাঁহারাও মহাভারত পড়িবার ও শুনিবার জন্য ব্যগ্র, যেহেতু ইহার গল্পসমূহও বিশেষ আনন্দপ্রদ। এইরূপ এইরূপ কারণে এতদ্দেশীয় শাস্ত্রী, কবি ও গল্পপ্রিয়, এই তিন শ্রেণীর লোকের নিকট মহাভারত

অদ্য পর্য্যন্ত যৎপরোনাস্তি সমাদর প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; এবং তদনুসারে মহাভারতের দুই তিন প্রকারের ভাষানুবাদ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

এই মহাভারত গ্রন্থ অতিবিস্তীর্ণ। এত বিস্তীর্ণ যে, আজকালকার কার্য্যব্যগ্র নিরবসর সাংসারিক লোক ইহার পঠন পাঠন সমধিক দুষ্কর বোধ করেন, এবং মহাভারতের কোথায় কি আছে জানিবার ইচ্ছা করিলে বিস্তৃত বিধায় সে ইচ্ছার পূরণ করিতে সকলেই অসমর্থ ও অবসন্ন হইয়া পড়েন। আমরা দেখিতে পাই, সময়ে সময়ে আমাদের মধ্যে কাহার কাহার পুরাকালের সমাজ, ধর্ম্মানুষ্ঠান, নীতি ও জাতীয় ইতিহাস এবং বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয় এবং বর্ত্তমান কালের কোন কোন বিষয় প্রমাণিত করিবার জন্যও মহাভারতের অংশবিশেষ দেখা আবশ্যক বলিয়া অবধারিত হয়। পরন্তু, সমুদ্রতুল্য বিস্তীর্ণ মহাভারতের মধ্য হইতে ঐ সকল প্রয়োজন সিদ্ধ করা আজকালকার নিরবসর লোকের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। সুতরাং অমুকের অমুকের মহাভারত মুদ্রিত, প্রচারিত ও তন্নিবন্ধন সুপ্রাপ্য হইলেও তাঁহাদের পক্ষে কার্য্যতঃ বা ব্যবহারতঃ মহাভারতের যে অভাব সেই অভাবই রহিয়া গিয়াছে, তাহার পূরণ হয় নাই। তাই কোন কোন ভারত-তত্ত্ব-বুভুৎসু বুদ্ধিমান্ লোকের পক্ষ হইতে এইরূপ একটী প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে যে, সমুদ্রতুল্য মহাভারতের একটী সংক্ষেপ সংকলন প্রস্তুত হইলে বোধ হয় প্রাগুক্ত জিজ্ঞাসুদিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। যাঁহারা সেই প্রাগ্বর্ত্তী সুদূর কালের আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রীয় ব্যাপার প্রভৃতি জানিবার জন্য উৎসুক, তাঁহাদের পক্ষে ত সুবিধা হইবেই, তদ্ভিন্ন, যাঁহারা পুরাকালের বিবিধ ইতিবৃত্ত ও আখ্যায়িকা জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের পক্ষেও সুবিধা হইতে পারে। সংক্ষেপের বিবরণ কল্পে বোধ হয় এইরূপ ব্যবস্থা করিলে ভাল হইতে পারে। কবির কাব্যোচিত অতিরিক্ত বর্ণনা ও পুনরুক্তি প্রভৃতি বাদ দিয়া একভাগে কেবলমাত্র সরল ও নিরলঙ্কার গল্পগুলির সংকলন ও অপর একভাগে বিবিধ শাস্ত্রীয় ভাবের সংকলন অথবা একই ভাগে গল্পসংকলনের নিম্নে টীকার অনুরূপে শাস্ত্রীয় ভাবের সংকলন।

আমার মনে হয়, এই প্রস্তাবটী সমীচীন ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। এরূপ প্রস্তাবকে আমরা অন্যায় বা অস্বাভাবিক ভাবিতে পারি না। আমরা দেখিতে পাই, সকল জিজ্ঞাসু সমান নহেন। কেহ বা সংক্ষেপে জানিতে ইচ্ছা করেন, কেহ বা বিস্তৃত জানিবার বাঞ্ছা করেন। মহাভারতের দ্বিতীয় প্রচারক সূত

মুনিও বলিয়াছেন "ইষ্টংহি বিদুষাং লোকে সমাস-ব্যাস-ধারণম্"। সমাস শব্দের অর্থ সংক্ষেপ ও ব্যাস শব্দের অর্থ বিস্তার। ইনি আরও বলিয়াছেন যে, মহাভারত প্রণেতা ব্যাস মহামুনিও প্রোক্ত কারণে সংক্ষেপ ও বিস্তার দুই প্রকার মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন।

"ইদং শত সহস্রন্তু লোকানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
উপাখ্যানৈঃ সহ জ্ঞেয়মাদ্যং ভারতমুত্তমম্॥
চতুর্বিংশতিসাহস্রং চক্রে ভারতসংহিতাম্।
উপাখ্যানৈর্বিনা তাবৎ ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥"

এক উপাখ্যানযুক্ত লক্ষশ্লোকী মহাভারত, অপর উপাখ্যানবর্জ্জিত চতুর্বিংশতিসহস্রী ভারত সংহিতা। এই দ্বিতীয় মহাভারতে বা মহাভারতসংহিতায় কুরুপাণ্ডবের কথা ব্যতীত প্রসঙ্গাগত উপাখ্যানাদি নাই। পরন্তু, শাস্ত্রসন্নিবেশ উভয়ত্রই আছে। মহাভারতে যে যে শাস্ত্রের কথা বা মূল সূত্র আছে তাহার একটা সংক্ষেপ তালিকা প্রদত্ত হইতেছে। বেদার্থ, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ, উপনিষদের অর্থ, বৈদিক ধর্ম্মকাণ্ড, যোগশাস্ত্র, সাংখ্যশাস্ত্র, ভক্তিশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, মীমাংসাশাস্ত্র, বেদান্তশাস্ত্র, চিকিৎসা, জ্যোতিষ, পাশুপত, ভূগোল সন্নিবেশ, অর্থশাস্ত্র, কলা বা শিল্প, নীতি এবং ছন্দ, অলঙ্কার ও ইতিহাস প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র। এই সকল শাস্ত্র যে যে স্থলে, যে যে ভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে, সে সকল উটুঙ্কিত অর্থাৎ উল্লেখ করিতে হইবে। কত সংক্ষেপে গল্পভাগ প্রণয়ন করা উচিত তাহাও অপর এক বিবেচ্য কথা। বোধ হয় এইরূপ সংক্ষেপ অভীষ্টসাধক হইতে পারে।

মহাভারত অষ্টাদশ মহাপর্ব্বে সমাপ্ত। প্রত্যেক মহাপর্ব্বের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবান্তর পর্ব্বও আছে। প্রথম আদি পর্ব্ব, ইহা ১৯টী অবান্তর পর্ব্বে সম্পূর্ণ। সেই সকল অবান্তর পর্ব্বের নাম অনুক্রমণিকা, পর্ব্বসংগ্রহ, পোষ্য পৌলোম, আস্তীক, অংশাবতরণ, সম্ভব, জতুগৃহ, হিড়িম্ববধ, বকবধ, চৈত্ররথ, স্বয়ম্বর, বৈবাহিক, রাজ্যলম্ভ, অর্জ্জুনবনবাস, সুভদ্রা-হরণ, হরণাহরণ, খাণ্ডবদাহ ও ময়দর্শন।

অনুক্রমণিকা ও তাহার সংক্ষেপ।

নৈমিষারণ্যবাসিশৌনক ঋষি দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত আছেন, এমন সময়ে লোমহর্ষণ পুত্র উগ্রশ্রবা সৌতিমুনি যাদৃচ্ছিক পর্য্যটন প্রসঙ্গে সেই যজ্ঞসভায় আগমন করিলেন। সৌতির আগমনে ঋষিবৃন্দ সন্তুষ্ট হইলেন,

এবং আগমন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি জনমেজয় রাজার সর্পযজ্ঞে বৈশম্পায়নের মুখে ব্যাসের মহাভারত শ্রবণ করিয়া বিবিধ তীর্থ পর্য্যটন ও কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধস্থান সমন্ত পঞ্চক সন্দর্শন করত: আপনাদিগকে দেখিবার জন্য এই স্থানে আগমন করিয়াছি। সৌতির এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে ঋষিরা মহাভারত শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন ও ঋষিদিগের অনুরোধে সৌতিও মহাভারত বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আগে ব্রহ্মস্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ, পরে সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা বর্ণন, তৎপরে সৃষ্ট্যারম্ভ বর্ণন, পরিশেষে সংক্ষেপে ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত জীবজগতের উৎপত্তি ও কুরু-বংশ, যদুবংশ, ভরতবংশ প্রভৃতি বিবিধ বংশের উৎপত্তি বর্ণন করিলেন। পরে বলিলেন, মহামুনি ব্যাস লিখিষ্যমান মহাভারতের বিষয় এইরূপ এইরূপ বিষয় সকল মনে মনে সংকলন করিয়া, গণপতির দ্বারা তাহার লিপিকার্য্য করিয়া-ছিলেন। অপিচ, গণেশ বলিয়াছিলেন যে, যদি আমার লেখনীকে বিশ্রাম করিতে না হয় তাহা হইলে আমি লিখিতে পারি। তদুত্তরে ব্যাসও বলিয়া-ছিলেন, আপনি শ্লোকার্থ না বুঝিয়া লিখিবেন না। গণপতি সহসা বুঝিতে না পারেন, এই অভিপ্রায়ে, ব্যাস মধ্যে মধ্যে অতি দুর্ব্বোধ্য কূটশ্লোক বলিতেন। সেই শ্লোক ব্যাসকূট নামে প্রসিদ্ধ এবং তাহার সংখ্যা সমগ্র মহাভারতে ৮৮০০। তৎপরে মহাভারতের মুখ্য অবলম্বন কুরুপাণ্ডবদিগকে বৃক্ষরূপকে বর্ণনা ও বক্ষ্যমান মহাভারতের একটা সংক্ষেপ বিষয়সূচী বর্ণন করিয়া, অনুক্রমণিকাপর্ব্ব সমাপ্ত করিয়াছেন। এই পর্ব্বে সৌতি বলিয়াছেন, কাহার কাহার মতে আস্তিক পর্ব্বে মহাভারতের প্রারম্ভ এবং কাহার কাহার মতে উপরিচয় বসুর উপাখ্যানে মহাভারতের আরম্ভ। সৌতির এই উক্তি শুনিলে মনে হয়, আস্তিক পর্ব্বের পূর্ব্ববর্ত্তী কথা কতক সৌতির ও কতক বৈশম্পায়নের, ব্যাসের নহে।

এই পর্ব্বের তিনটী স্থান শ্রুতিমূলক। মঙ্গলাচরণোক্ত ব্রহ্মলক্ষণ, সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা বর্ণন, সৃষ্ট্যারম্ভ বর্ণন ও দেব ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তি বর্ণন। টীকাকারেরা সেই সেই শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া ঐ সকল স্থানের টীকায় যোজনা করিয়া দিয়াছেন। পৃথক এক খণ্ড পুস্তকে হউক, আর একই খণ্ডে আখ্যায়িকা পংক্তির নিম্নে টীকা রূপে হউক সেই সকল শ্রুতি উঠাইয়া যোজনা করিলে শাস্ত্রার্থ প্রদর্শন করা হইবে। যদি সমগ্র মহাভারতের আলোচনা পূর্ব্বক বর্ণিত প্রকারের একখানি পুস্তক প্রস্তত করা হয়, তাহা হইলে বোধ হয় প্রাগুক্ত জিজ্ঞাসুদিগের অভিমত সংক্ষেপ-মহাভারত জন্মলাভ করিতে পারে।

প্রেম।

'প্রেম' শব্দটী অতি মধুর; এমন মধুর শব্দ, এমন মধুর সামগ্রী বুঝি সংসারে আর নাই। বালক যুবা বৃদ্ধ যে-ই হউন, প্রেমের মধুর ভাবে, প্রেমের মদিরাময় আবেশে, প্রেমের মোহিনী মন্ত্রে সকলেই মুগ্ধ। প্রেমের অন্ধ কুহকে সকলেই আত্মহারা। এই প্রেম, সাহিত্য দর্শন বা বিজ্ঞানের দ্বারা প্রতাত হয় না, ইহা স্বভাবতঃ, মাতৃবক্ষে ক্ষীর সঞ্চারের ন্যায়, প্রত্যেক জীবের অন্তরে পূর্ণভাবে উদয় হইয়া থাকে।

প্রেমময় ঈশ্বরের অনন্ত অসীম জগতের যেদিকে দৃষ্টিপাত কর, সকল বস্তুতেই তাঁহার প্রেমের ছবি দেদীপ্যমান। ঐ যে বালার্ক-সিন্দূর-বিন্দু ললাটে পরিয়া প্রেমময়ী ঊষা ধীরে ধীরে আগমন করিতেছেন, উনি প্রেমের ছবি। ঊষার প্রেমে জগৎ নবজীবন লাভ করিয়া হাস্য করিতেছে, ঊষার প্রেম-অনুরাগে বিহগেরা মধুর কুজন করিতেছে, ঊষার শুভ্র আলোকচ্ছটায় দশদিশি উদ্ভাসিত। ঊষার মধুর স্পর্শে কুসুমবালাগণ বিকসিত। ঊষার আগমনে কমলিনীনাথ বিরহক্লিষ্টা কমলিনীর প্রফুল্ল-বদনখানি অনুরাগে চুম্বন করিয়া প্রফুল্ল করিতেছেন। তাই বলি ঊষা প্রেমময়ী। কেবল ঊষাগমে প্রণয়ীযুগল বিরহ বেদনা হৃদয়ে লইয়া পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করে ও রজনীর অপেক্ষায় ক্ষুণ্ণমনে সময় কাটায়। কিন্তু, বিরহের পর মিলন সুখকর বলিয়াই, ঊষা প্রেমিক যুগলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। ঊষার আগমনে বৃক্ষশাখাগুলিও শিশিররূপ প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছে। তাই বলি, এ জগতে প্রেম বন্ধনে সকলেই আবদ্ধ। এ পার্থিব সংসার প্রেমের বলেই চালিত; মানব হৃদয়কে ভগবান যদি এত প্রেমময় না করিতেন, তাহা হইলে জগতে জীবনধারণ বিড়ম্বনা হইত। প্রেমের জয় সর্ব্বত্রই। প্রেম জড়ে চেতনে অপ্রতিহত ভাবে নিত্য জাগ্রত। যেদিকে চাও সেই দিকেই সংসারে প্রেমের অব্যর্থ অমোঘ আকর্ষণী শক্তি দেখিবে; বিশাল ব্যোম রাজ্যে গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডল এই অচ্ছেদ্য প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইয়া চিরদিনই আপন আপন কেন্দ্রপথে ঘূর্ণিত হইতেছে। ওই যে অত্যুচ্চ গিরিরাজ, ক্ষুদ্রকায় তটিনীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, তটিনী সুন্দরী সমীরণ ভরে নাচিয়া নাচিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, সাগরের দিকেই ধাবমান হইতেছে, দিবাকর উদয় হইয়া ধরার সহিত বদ্ধালিঙ্গন হইয়া উদয় হইতে অস্তাচল
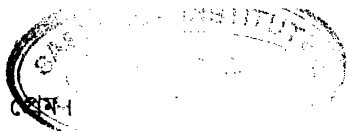
পর্য্যন্ত গমন করিতেছে, প্রেমের আকর্ষণী শক্তিই তাহার মূল। ওই যে ক্ষুদ্র কোমলকায়া ব্রততী উহাও প্রেমাবেশে সহকারকে বেষ্টন করিয়া আছে। সুনীল আকাশে সুধাকর, প্রেমামৃত বর্ষণ করিয়া, কুমুদিনীর ম্লানমুখখানি প্রফুল্লিত করিতেছেন; আবার, প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া প্রকৃতি সুন্দরী জগতকে অভিনব বেশে সাজাইতেছেন। তবে প্রেম স্থানভেদে, অধিকারিভেদে, পাত্রাপাত্র ভেদে নানা রূপ ধারণ করিয়া থাকে। কোথাও প্রেম প্রীতিরূপে, কোথাও প্রেম ভক্তিরূপে, কোথাও স্নেহরূপে, কোথাও বা বাৎসল্যরূপে, কোথাও প্রেম পূর্ণরূপে আবির্ভাব হয়।

একবার বৃন্দাবনবিহারি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম উন্মত্ততা দেখুন, তিনি সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ, সর্ব্ব কার্য্যের অনুষ্ঠাতা, সর্ব্ব ভূতের আধার হইয়াও নরদেহ ধারণ করিয়া প্রকৃতিরূপা প্রেমময়ী শ্রীরাধার প্রেমে এতই বিহ্বল হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মধুর মুরলী দিবানিশি রাধা নামেই সাধা ছিল। রাধানাথ রাধাপ্রেম-মন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়া জগৎকে প্রেম শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। প্রেমময়ী শ্রীমতীর প্রেমে তন্ময় হইয়াই "দেহি পদপল্লবমুদারং" বলিয়াছিলেন। রাধাপ্রেমে তাঁহার ফুল্লারবিন্দ নয়নে জলধারা বিগলিত হইত। রাধাপ্রেমে ময়ুর ময়ুরী নৃত্য করিত, যমুনা উজান বহিত, বৃন্দাবনের তরুলতাও দোলায়মান হইত। ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জন করিত, রাধাপ্রেমে কুঞ্জের শারিশুকও জয়রাধে বলিয়া গান গাহিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমের জন্যই নন্দের বাধা মস্তকে বহন করিয়াছিলেন। এবং রাধাপ্রেমে আত্মহারা হইয়া বলিয়াছিলেন—

রাই তুমি যে আমার গতি
তোমার লাগিয়া প্রেমতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি।

আবার, যশোদা মাতার বাৎসল্য প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বন্ধনহীন কর্ম্মহীন ভগবান তাঁহার নিকট বন্ধন দশাও ভোগ করিয়াছিলেন। এই প্রেম অপার্থিব, রাধাকৃষ্ণের প্রেম অমূল্য। এ প্রেমে ভোগতৃষ্ণা ছিল না, আসঙ্গলিপ্সাও ছিল না, কামগন্ধও ছিল না, তাই এই প্রেমের মোহিনীমন্ত্রে গোপিকারা প্রেমরজ্জুতে তাঁহাকে বন্ধন করিয়াছিল, তাই কৃষ্ণপ্রেম পিপাসিতা গোপিনীগণ তাঁহার মুরলীর মধুর ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া গৃহকার্য্য বিস্মৃত হইত। লজ্জাসরম, কুল, মান, ভয় ত্যাগ করিয়া পতিপুত্র আত্মীয় পরিজন ত্যাগ করিয়া যমুনাতটে কদম্বতলে ও বিজন বিপিনে আসিয়া উপস্থিত হইতেন।

তাঁহার মধুর অধরের মূরলী ধ্বনিতে মুগ্ধা হইয়া শ্রীমতী গুরুগঞ্জনা লজ্জাভয় কুলমান ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপ্রেম পিপাসিতা হইয়া কুঞ্জ কাননে মিলিতা হইতেন।

শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরীর প্রেম গানে জগৎ বিমুগ্ধ ও আত্মহারা হইত। প্রেমময়ের আহ্বানে গোপিকাগণ আর স্থির থাকিতে পারিতেন না। তাঁহাদের শরীর অবসন্ন হইত, চেতনা বিলুপ্ত হইত, বাহ্যজ্ঞান রহিত হইত। কৃষ্ণপ্রেম-পাগলিনী ব্রজগোপিকাগণ, শ্রীমতীর সহ, জগৎপতির অনঙ্গবর্দ্ধন প্রেমসঙ্গীতে আত্মহারা হইয়া মুগ্ধা হরিণীর ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিত। এই প্রেমচিত্র, কবি অতুল তুলিকায় কি মধুর ভাবেই পরিস্ফুট করিয়াছেন।

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং
ব্রজ স্ত্রীয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥

আহা এমন মধুর প্রেমের কি তুলনা আছে! বৈষ্ণবগ্রন্থাবলীতে যে সকল ললিত-পদ-বিন্যাস আছে, তাহা পাঠ করিলে নয়নে আপনিই অশ্রুধারা পড়িতে থাকে। মন ভক্তিরসে আপ্লুত হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের কোটীচন্দ্রবিনন্দিত বদনের অনুপম সৌন্দর্য্য যে একবার দর্শন করিত, সে তন্মুহূর্ত্তেই বিহ্বল হইত, তাহার চক্ষু আর ফিরিত না। তাঁহার মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন, বালক বৃদ্ধ যুবা যে শ্রবণ করিত সে-ই তৎক্ষণাৎ হরিপ্রেমে মত্ত হইয়া ভূমে লুণ্ঠিত হইত। আবার, প্রভু পাপাতাপী দেখিলেই আগে গিয়া সপ্রেম আলিঙ্গন করিতেন। জগাই মাধাইয়ের নিকট মার খাইয়াও বলিয়াছিলেন—"মেরেছ কলসী কানা, তা বলে কি প্রেম দিব না।" শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-সংকীর্ত্তনে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ মানব নিশ্চল হইত। আহা সে উচ্চ প্রেমের কি মধুরতাই ছিল! গৌর প্রেমের তুলনাই নাই। আবার প্রেমময় খ্রীষ্ট যখন জগতে জন্মগ্রহণ করেন তিনিও ভগবৎ প্রেমে আত্ম ভুলিয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিয়া জগতের হিতে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দৈত্যকুলচূড়ামণি ভক্ত প্রহ্লাদ হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া হলাহল পানেও কাতর বা ভীত হয়েন নাই। প্রেমের বলেই প্রহ্লাদ জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং রাজপুত্র ধ্রুব, শৈশবেই ভগবৎ প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া তপশ্চরণার্থ বনগমন করিয়াছিলেন ও অসীম প্রেম ভক্তিতে ভগবৎ চরণ লাভ করিয়াছিলেন—এই কৃষ্ণ প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়াই নারদ শুক সনকাদি দেবর্ষিগণ অমরত্ব লাভ করিয়া-

ছিলেন। আবার, রাজপুত্র শাক্য রাজ্য ঐশ্বর্য্য সম্পদ বিষয় বাসনা ভোগ-লালসা পরিত্যাগ করিয়া, পরম রূপবতী গুণবতী প্রতিপ্রাণা ভার্য্যা গোপাকে ত্যাগ করিয়া, নবপ্রসূত কুমারকে ত্যাগ করিয়া, পিতা মাতার স্নেহ ত্যাগ করিয়া এই জরামৃত্যু ব্যাধি নিষ্পাড়িত সংসারের অসারতা দেখিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং অসংখ্য নরনারীকে মুক্তিপদের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বুদ্ধের প্রেমমন্ত্রে অনেকে দীক্ষিত হইয়া নির্ব্বাণপদে অগ্রসর হইয়া-ছিলেন। শাক্যদেবের সার্ব্বজনীন প্রেমে জগৎ উন্মত্ত হইয়াছিল। এদিকে শুভক্ষণে, শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে শচী মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া হরিপ্রেমে জগত মাতাইয়াছিলেন। তিনি হরিপ্রেমে মত্ত হইয়া হরিধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপা-ইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের ভুবনমোহন রূপ মাধুরী ও তাঁহার শ্রীমুখের মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন যে শুনিত, সে আর প্রকৃতিস্থ থাকিত না। শ্রীচৈতন্য দেব জগতের প্রেম-শিক্ষাদাতা, তিনি সন্তানবৎসলা শচীমাতাকে ত্যাগ করিয়া পতিপ্রাণা প্রণয়িণীবিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করিয়া হরিপ্রেমে আত্মহারা হইয়া, বিহ্বল হইয়া, একমাত্র কৌপিনধারণ পূর্ব্বক জগতের জীবকে প্রেমশিক্ষা দিবার জন্যই সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন।

জগতে এই প্রেমই সংসার বন্ধনের মূলীভূত কারণ; প্রেমের বলেই মানব বলীয়ান। তাই, মানবসমাজে, সংসারবন্ধনের মূল প্রেমের জন্যই, স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ বন্ধনের সৃষ্টি হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষের মিলনে বিবাহ বন্ধনে যে পবিত্র বিমল দাম্পত্য প্রেমের সৃষ্টি হয়, সে প্রেম অতুলনীয়। দাম্পত্য প্রেমের ন্যায় এমন স্বর্গীয় ভাব, এমন নির্ম্মলতা ও এমন পবিত্রতা আর কিছুতেই নাই। সংসারে পতিপত্নীর একাত্মতা অতি সুখের, তাই দাম্পত্য প্রেম, সংসারে স্বর্গ। এমন হৃদয় স্নিগ্ধকর, প্রাণোন্মাদকর, অন্তস্তলস্পর্শী সুখকর দাম্পত্য প্রেম ছাড়া জগতে এমন কি আছে যাহাতে আমিত্ব লোপ হইয়া যায়। নিস্বার্থ দাম্পত্য প্রেমে জীবকে যখন আত্মহারা করে, তখন আমিই তুমি, তুমিই আমি, তুমিই শরীরের অর্দ্ধাংশ, তোমার অভাবে আমার অভাব, তুমিই দেহ আমি ছায়া, তুমিই আত্মা আমি প্রাণ, তুমিই কার্য্য আমি কারণ এই ভাব হইয়া পড়ে। এইরূপ তদীয়তা মদীয়তাই দাম্পত্য প্রেমের চরমোৎকর্ষ। তোমার সুখেই আমার সুখ, তোমার প্রেমেই আমার স্বর্গ, তোমার আহারেই আমার পরিতৃপ্তি, তোমার মোহিনী রূপেই আমার নয়ন মুগ্ধ, তোমার মধুর স্বরেই কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে, তোমার বিনাবিনিন্দিত মধুর সম্ভাষণ আমার শ্রবণে পীযূষধারা

মনে হয়। তোমার কোমল কটাক্ষে হৃদয়ের অন্তস্তল বিদ্ধ হয়, তোমার হাস্যে জ্যোৎস্না ফুটে, কণ্ঠে পিক্‌কাকলী শ্রুত হয়, তোমার প্রত্যেক পদ বিন্যাসে আমার হৃদয়তন্ত্রী নাচিয়া উঠে। এইরূপ স্বার্থশূন্য প্রেমই বিশুদ্ধ, ইহাতে ভোগাসক্তির লেশ মাত্র থাকে না—ইহাই নির্ম্মল—নির্ব্বিশেষ প্রেম। এই প্রেমেই মত্ত হইয়া বিল্বমঙ্গল ঠাকুর মৃতশব আলিঙ্গন, ও রজ্জুজ্ঞানে বিষধর সর্প আশ্রয় করতঃ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। প্রেমে তন্ময় হইলে, মানবের রূপ বিচার থাকে না, সম্বন্ধবিচার থাকে না, আত্মপরভেদ থাকে না, কুলমান থাকে না, জাতিবিচারও থাকে না। ইহাই ঐকান্তিক প্রেম। এই প্রেমই ভগবৎ প্রেম নামে অভিহিত।

শ্রীমতী "নীতি-কবিতা" রচয়িত্রী।

প্রথম দৃষ্টি।

ভুবন-মোহিনী উষা ধীরে ধীরে আসি'
সাজায়ে রাখিতেছিল চারু ফুল রাশি
থরে থরে কাননে কাননে ; নীড়ে নীড়ে
জাগাইয়া বিহঙ্গমে ধীরে ধীরে ধীরে
শিখাইয়া দিতেছিল সুমধুর সুর
স্বরগ-সুষমা মাখা, সুধা ভরপূর।
শীতল সমীর ধীরে করিতে ব্যজন
দিতেছিল কানে কানে কহি সুশোভন
সু-চির লাবণ্যময় সুপ্ত ধরাতলে
নিশির শিশির দিয়ে—শ্যাম তৃণদলে
রচিয়া রাখিতেছিল কোমল আসন
অতুল সোহাগ ভরে—করিয়া যতন।
কে যেন সফল করি দিবে দরশন
চির সহচরী বেশে ; তারা-বালাগণ
'যাই' 'যাই' ক'রে ফিরে পারেনা যাইতে
ব্যাকুল যেনগো কার মু'খানি চাহিতে
এ সুখদ শুভক্ষণে ; এমন সময়
আকুলিয়া জগতের সকল হৃদয়
দেখা দিলে তুমি প্রিয়ে, অসীম উদার
রঙিণ্ আকাশতলে দিগন্ত প্রসার
শ্যামল ধরণী বুকে !—নিখিল ভুবন,
উঠিল সত্রস্ত হয়ে !—যুগল চরণ
পুলকে করিল ধৌত নীহার কুমারী
আপন নয়নজলে ; উঠিল ঝঙ্কারি'
কুলায় বিহগবৃন্দ ; স্নিগ্ধ সমীরণ—
তব ও কমলকায় করিয়া বীজন—
দোলায়ে সোহাগ ভরে নিবিড় চিকুর
ছুটিল বাসিত হয়ে মধুর-মধুর !
বিকচ কুসুমমালা গাঁথি নিজ হাতে
উষারাণী কোথা হতে আসিয়া চকিতে
পরাইয়ে দিল প্রিয়ে, গলায় তোমার
অনুপ প্রণয়ে গলি' ! অমনি আমার—

টুটিল ঘুমের ঘোর ; আপনা ভুলিয়া
ও ললিত মুখ পানে দেখিনু চাহিয়া
অকস্মাৎ অনিমেষ, চারিটী নয়ন
লভিল কি মধুময় প্রথম মিলন !

দিকে দিকে দিক্-বধূ শঙ্খ-বাজাইয়া
বরণ করিল দোঁহে ; হরষে হাসিয়া
তারা-বালাগণ কোথা গেল পলাইয়া
লাজাঞ্জলি দোঁহাকার শিরে বরষিয়া !!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

স্বদেশী বৈদ্যক ও বনৌষধি।

সম্প্রতি সমগ্র ভারতবর্ষে স্বদেশী দ্রব্য প্রচারের যেরূপ আন্দোলন ও আয়োজন হইতেছে তাহাতে আশা করা যায় যে, আমাদিগের সম্যক্ যত্নে ইহা কালে সুফলে পরিণত হইবে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষ কি শিল্প, কি বিদ্যা, কি বাণিজ্য, কি বৈদ্যক ও ভেষজ সকল বিষয়েই জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল। ভারত সন্তানগণ ঐ সকলের সৌকর্য্য সাধন করিয়া ভারতভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা স্বেচ্ছায় সে সকল অবহেলা করিয়া আজ ঘোর দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা উপভোগ করিতেছি। দুঃখ, দারিদ্র্য, ব্যাধি প্রভৃতি নানা কারণে আজ ভারতবাসীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার এত হ্রাস হইয়াছে। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, স্বদেশীয় দ্রব্য বর্জ্জন ও বিদেশীয় বস্তুর বহুল প্রসার ও ব্যবহারই ইহার প্রধান কারণ।

ভারতবর্ষের জল বায়ু, আচার, বিচার ও ব্যবহার ভারতবাসীর স্বাস্থ্যের চির অনুকূল। সুতরাং ঐ সকল উপেক্ষা করিয়া, আমাদের স্বাস্থ্যের ও ধর্ম্মের প্রতিকূল বিদেশীয় দ্রব্যাদি পান ভোজন করায়, আমাদের এতাধিক শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্যের কারণ হইয়াছে। পরন্তু সেই সকলের পরিহার পরম হিতকর। তবে যে সকল বিদেশীয় বস্তুতে আমাদের পুরুষার্থ সাধন হয়—যদ্দ্বারা আমরা ইষ্টলাভ করিতে পারি, তত্তদ্ বিষয়ের প্রতি আমাদের যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য ; সেই সকলের পরিরক্ষণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, পক্ষান্তরে কতকগুলি বিষয়ের পরিবর্জ্জনও সেই ভাবে কর্ত্তব্য।

হিতাহিত জ্ঞান, ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা, ঈশ্বর আমাদিগকে দিয়াছেন, যদ্দ্বারা আমরা জগতের প্রত্যেক বিষয় হইতে কিছু না কিছু পরিমাণে শিক্ষা লাভ করিতে পারি, এবং খাদ্যাখাদ্য বিচারে সমর্থ হই। জগতে অতি সামান্য কীট পতঙ্গও স্বভাব সংস্কার হেতু আপন আপন স্বাস্থ্যোপযোগী খাদ্যাখাদ্য

নির্ণয়ে সমর্থ। স্রষ্টার সৃষ্টি চেষ্টার চরম সীমা মানবজাতি। অপরাপর জীব অপেক্ষা মানব জ্ঞান বুদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে অনেক উন্নত। প্রত্যুত যদ্যপি আমরা এই সকল সামান্য কীট পতঙ্গের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে তাহা হইতেও আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারি। যে সকল বস্তু উত্তম, যাহা হইতে আমরা কিছু জ্ঞানলাভ করিতে পারি, সে সকল যত্নপূর্ব্বক আমাদের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রকারগণ এইজন্য বলিয়া গিয়াছেন,—

"অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলোনরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষটপদঃ" ॥

সুতরাং যাহা বিচারপূর্ব্বক সারভূত বলিয়া বিবেচিত হইবে, তৎসমুদায় অবলম্বন করা যুক্তিসঙ্গত।

পূর্ব্বে মুনিঋষিগণ বহু যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া নানা প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, দেশ কাল পাত্র অনুসারে যে সকল বিধান তাহাতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সে সকল সর্ব্বতোভাবে আমাদের হিতজনক, কিন্তু, আমরা ভ্রমপ্রমাদপ্রযুক্ত অথবা নব নব বিদ্যার প্রভাবে সেই সকল বিধিবাক্য প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ, পরন্তু, সে সকলকে নিরর্থক জ্ঞানে অবহেলা করিয়া থাকি।

সকল পুরুষার্থের মুখ্য সাধন শরীর রক্ষা; তাহার রক্ষা, পুষ্টি ও বর্দ্ধন প্রত্যেক মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে সেই সকল করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদের পান ভোজন ও ঔষধাদি সেবনের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, স্বদেশজাত দ্রব্যই আমাদের স্বাস্থ্যের উপযোগী সুতরাং বিবেচনা পূর্ব্বক সেই সকল বিষয়ের পরিরক্ষণ প্রয়োজন। অবতরণ স্থলে আমরা কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিব মাত্র। আহারবিধি সম্বন্ধে পূর্ব্বে 'অঙ্কুরে' কথঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে, তথাপি এস্থলে তদ্বিষয়ে সামান্য আলোচনা করিয়া পরে বৈদ্যক ও বনৌষধি বিষয়ের বর্ণনা করিব।

আহারের সহিত আমাদের স্বাস্থ্যের ও ধর্ম্মের নিত্য সম্বন্ধ। যে সকল আহার্য্যবস্তুর দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, ইন্দ্রিয়, মন ও চিত্তের প্রসন্নতা জন্মে, তত্তদ্ বিষয় সম্বন্ধে আর্য্যশাস্ত্রকারগণ নানারূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রে, সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; গুণভেদে ঐ সকল আহারীয় সামগ্রী মানব শরীরে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে।

সাত্ত্বিক আহারে মানবের বল, বীর্য্য, স্নিগ্ধতা পরমায়ু ও সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করে; রাজসিক আহার পূর্ব্বোক্তরূপ কার্য্যকারী হইলেও তদ্দ্বারা ন্যূনাধিক পরিমাণে রিপুর উত্তেজনা, ইচ্ছা ও স্বভাব শক্তির উন্মেষ হয়; এবং তামসিক আহারে ইন্দ্রিয় বৃত্তির প্রাবল্য, স্বেচ্ছাচার ও পশুধর্ম্মের বিকাশ হয় এবং তদ্দ্বারা পরমায়ুরও হ্রাস হইয়া থাকে। অতএব আমাদের শরীর ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য স্বাস্থ্যের ও ধর্ম্মের অনুকূল, শাস্ত্রোক্ত আহারবিধি অবলম্বনই কল্যাণকর, তদ্বিপরীত অনিষ্টজনক।

সম্প্রতি বিজাতীয় শিক্ষার দোষ, ও তন্নিবন্ধন শাস্ত্রানুশাসনে অশ্রদ্ধা হেতু আমরা বিজাতীয় পান ভোজনে ক্রমশঃ অন্নজীবী হইয়া পড়িতেছি। অল্প বা অশিক্ষার প্রভাবে শাস্ত্রীয় বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া ক্রমেই আচার বিহীন হইয়া পড়িতেছি। মোহ বশতঃ শাস্ত্রবিরোধী বিদেশীয় বস্তুর ব্যবহারের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ফলতঃ তদ্দ্বারা যে আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির হ্রাস হইবে তদ্বিষয়ে আর বিচিত্রতা কি?

আজকাল সমাজে সোডাওয়াটার, লিমনেড প্রভৃতি ক্ষারবিশিষ্ট পেয় পদার্থের নিত্য সেবন, বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে। এই সকল পেয় পদার্থ যে, কতদূর স্বাস্থ্যের অনিষ্টকারক তাহা আমরা কখন বিবেচনা করিয়া দেখি না। সামান্য চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে প্রথমতঃ, আমরা আচার বিহীন হইয়া, যাদৃচ্ছিক আহারে ব্যাপৃত থাকায়, আমাদের বীর্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছে, তদুপরি ঐ সকল ক্ষারবিশিষ্ট দ্রব-দ্রব্যের অতি-মাত্রা সেবনে আমাদিগকে অধিকতর হীনবীর্য্য করিয়া ফেলিতেছে। ক্ষার বহুল দ্রব্যের অত্যধিক সেবনে শারীরিক পিত্ত ধাতু বিকৃত হইয়া শোণিত ও শুক্র, উভয় ধাতুকে বিপন্ন করিয়া তুলে। বিদেশীয় দ্রবপদার্থ ও ঔষধ প্রভৃতিতে ন্যূনাধিক পরিমাণে মদ্য (Alcohol or Spirit or Gas) সংযোগ আছে, সুতরাং সে সকল দ্রব্য বা ঔষধ, উষ্ণপ্রধান দেশের, দারিদ্র্য-প্রপীড়িত বঙ্গবাসীর ক্ষীণ মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইলেও অধুনা সে সকলের ব্যবহার অপরিহার্য্য রূপে আমাদিগের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে।

প্রত্যুত ঐ সকলের ফলে ভারতবর্ষে নানাবিধ নূতন নূতন রোগেরও প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; এবং আমরা সেই সকল রোগের প্রতীকার করিবার জন্য বিদেশীয় রূক্ষ ঔষধাদি সেবন করিয়া থাকি। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ঐ সকল ঔষধ, আমাদের স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী বিধায়, আমাদিগের শারীরিক,

মানসিক এবং আর্থিক শক্তির হ্রাস, বহুল পরিমাণে হইয়া পড়িয়াছে। সূক্ষ্ম-তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সু-শিক্ষার অভাবই ইহার প্রধান কারণ। শিক্ষার দোষে আমরা নিম্নলিখিত ৫টী বিধি প্রতিপালনে উদাসীন, (১মঃ) বিধিবিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা, (২য়ঃ) তন্নিবন্ধন সেই সকলের প্রতি অশ্রদ্ধা, (৩য়ঃ) বিজাতীয় আহার, আচার প্রভৃতি অনুকরণের আতিশয্য, সুতরাং (৪র্থ) স্বেচ্ছাচারিতার প্রাবল্য, (৫ম) আলস্য। এইরূপ, এইরূপ কারণে,—বিদেশীয় বিলাস বিভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া, আমাদের মস্তিষ্ক এরূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে, আমরা একবারও, আমাদের স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের উপযোগী নিয়ম প্রতিপালন করিবার চেষ্টা বা ইচ্ছা করি না। ফলতঃ, আমরা স্বকৃত কর্ম্মফলেই, এতাধিক কষ্ট ভোগ করিতেছি।

সম্প্রতি ভারতে স্বদেশীয় আন্দোলন স্রোতঃ যে ভাবে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাতে যদ্যপি আমরা এখন হইতে পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া, স্বাবলম্বন আশ্রয় করতঃ স্বদেশীয় পান ভোজন, দেশীয় বৈদ্যক ও বনৌষধিজ্ঞান যথাসম্ভব সম্পাদন করিতে চেষ্টা করি—শাস্ত্রোক্ত বিধিমার্গ অবলম্বন করি, তাহা হইলে আশা করা যায় যে, অচিরাৎ আমাদের সৌভাগ্য তপন সমুদিত হইবে।

অতঃপর আমাদের স্বদেশীয় প্রাচীন বৈদ্যক ও বনৌষধি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। পূর্ব্বে যখন ভারতবর্ষে বিদেশীয় ঔষধাদির প্রসার বৃদ্ধি হয় নাই, ভারতবর্ষ তখন স্বদেশজাত বস্তু ও বনৌষধি বিষয়ে গৌরবান্বিত ছিল; এখনকার মত ভারতবর্ষে তখন নূতন নূতন রোগেরও প্রাদুর্ভাব হয় নাই। তৎকালে যে সকল ব্যাধি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পরিদৃষ্ট হইত, আর্য্যশাস্ত্রকারগণ, তৎসমুদায়ের প্রতীকার ও বিধান চিকিৎসাশাস্ত্রে বহুল পরিমাণে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। বনৌষধি বিজ্ঞান, তৎকালে বহুদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রেই, এমন কি গৃহিনীগণও কিয়ৎ পরিমাণে অবগত ছিলেন। এখনকার মত সদ্যপ্রসূত শিশুদিগের পীড়ায় পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তার ডাকিবার প্রয়োজন হইত না, গৃহিনীগণ আপনারাই সে সকলের চিকিৎসা করিতেন। অপরাপর পীড়ার জন্য অবস্থানুসারে বনৌষধির প্রয়োগ হইত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই সকলের যথা সম্ভব আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। নিম্নে কয়েকটী উল্লিখিত হইল।

কালমেঘ।—অস্মদ্দেশে ইহাকে দেশী চিরাতাও বলে। ইহা কটু, বলকারক ও পাকাশয়ের পরম হিতকর। অতিসার রোগের প্রবলাবস্থায় ইহা

প্রযুক্ত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা কালমেঘের পাতার রসের সহিত, এলাচ, লবঙ্গ ও দারুচিনি বাটিয়া 'আলুই' নামক বটিকা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। শিশুদিগের পেট ব্যথা, দাস্ত ও ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি পীড়ায় ইহা বিশেষ উপকারী।

কুটজ।—প্রচলিত কথায় ইহাকে কুড়চি বলে। বৈদ্যকশাস্ত্রে ইহার গুণ বিশেষ রূপে উক্ত হইয়াছে। অতিসার, রক্তদোষ, কফ, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। ইহা আম, পিত্ত ও তৃষ্ণা বিনাশক। পুরাতন রক্তামাশায় ও অন্ত্রের পাড়ায় ইহা অমোঘ ফলপ্রদ। ইহার ফুল বলকারী, অগ্নিদ্দীপক ও ক্রিমি সংহারক * বালকদিগের রক্তামাশয়ের পীড়ায় ইহার কাথ বিশেষ ফলপ্রদ। পাঁচ পোয়া জলের সহিত ইহার বল্কল একতোলা, সিদ্ধ করিয়া দশ ছটাক শেষ নামাইয়া, এক কাঁচ্চা মাত্রায় দিবসে ৩।৪ বার সেবন বিধেয়। আজ কাল অনেক হাঁসপাতালেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

কুসুম্ব।—সাধারণ নাম কুসুমফুল। ইহা একটী আয়ুর্ব্বেদীয় মহৌষধ। ইহার গুণ :—বাতল, রূক্ষ, বিদাহী, কটু। মূত্রকৃচ্ছ দোষ কফ ও রক্তপিত্ত-বিনাশক। ইহার ফুল :—স্বাদু, ত্রিদোষনাশক, মেদকর ও কেশের শোভা-বর্দ্ধনকারী। কুসুম ফুলের চাষ ভারতের সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। ব্যবসায় ইহা একটী লাভজনক বস্তু। ইহা হইতে সুন্দর রঙ প্রস্তুত হয়, কিন্তু এ প্রবন্ধের অবিষয় বলিয়া তাহা পরিত্যক্ত হইল।

ইহার পত্রের গুণ :—মধুর, নেত্রহিতকর, অগ্নিবর্দ্ধক, ও রোচক।

অত্রিসংহিতায় উক্ত হইয়াছে :—

"কুসম্ভং রুচিকৃদ্বাতং হন্তিবলং রুচিপ্রদং
* * স্বাদু বিপাকে চ কফাপহম্।
কিঞ্চিচ্চাম্লং ভবেৎক্ষারং প্রশস্তমগ্নিমান্দ্যকে॥"

---

* কুটজঃ কটুকো রূক্ষো দীপনস্তুবরোহিমঃ।
অর্শোঽতীসার পিত্তাস্রকফং তৃষ্ণামকুষ্ঠমুৎ॥
* * *
রক্তদোষশ্বকং পিত্তং কুষ্ঠঞ্চৈবাতীসারকম।
কৃমিঞ্চৈব হরেদেতদ্বল্কং পূর্ব্বৈশ্চমুনিভিঃ॥
* * *
তৎপুষ্পং বাতলং শীতং তিক্তং পিত্তাতীসারজিৎ।
পুষ্পাস্তু বৎসস্তোক্তং তুবরশ্চাগ্নিদীপনম॥

হাম, হামজ্বর ও চর্ম্মরোগে, কুসুমফুল জাফ্রাণের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। মূত্র রোগে ইহার ক্বাথ পরম হিতকর। বাতের পীড়ায় ও ক্ষতরোগে ইহার তৈল মালিশ রূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

প্রসবের পর, কুসুমফুলের বীজের চূর্ণ, পুলটিস্ করিয়া প্রসূতির তলপেটের উপর দিলে গর্ভাশয়ের প্রদাহ নিবারিত হয়।

ক্রমশঃ।*

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

রমা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ওলাদেবীর আবির্ভাব।

যেখানে যত অধিক লোকের বাস, সেইখানে তত অধিক পীড়ারও প্রকোপ। একবার কোন জাতীয় পীড়া প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে সে স্থান শ্মশানে পরিণত না করিয়া বিদায়গ্রহণ করে না।

কলিকাতার তুল্য অসংখ্য লোকের বাস আর কোথাও নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাই এস্থানে যে পীড়া একবার প্রবেশ করে, তাহা আর সহজে ছাড়িতে চাহে না, প্রতি বৎসর প্লেগে মৃত্যু সংখ্যার হিসাব করিলেই, এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় কলেরাই প্লেগ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসংখ্য নরনারীর জীবন লইয়া টানাটানি করিত, ক্বচিৎ কাহাকে দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিত। যে সময় আমাদের প্রবোধকুমার ও মনোমোহন পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সেই সময় সহরে ওলাদেবীর প্রকোপ বৃদ্ধি হইয়াছিল। পিতা মাতা কখনই এরূপ ভীষণ স্থানে পুত্রকে ছাড়িয়া দিয়া থাকিতে পারেন না, কাজেই মনোমোহনের পিতা তাঁহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য বারবার পত্র লিখিতে লাগিলেন। এই মহানগরী কলিকাতায় আরও কিছুদিন থাকিলে সকল স্থানের দৃশ্য দর্শন করিয়া এবং নরেশবাবুর ভগ্নী-হত্যার একটা সুখবর জানিয়া

* বনৌষধি বিজ্ঞান আলোচনা যদি সাধারণের মনোজ্ঞ হয়, তাহা হইলে আমরা ক্রমশঃ ইহা প্রকাশ করিব, নচেৎ এই স্থলেই ইহার পরিসমাপ্তি হইল। (লেখক।)

স্বদেশযাত্রা করিবেন এইরূপ তাহাদের একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বার বার পিতার অনুরোধ এবং এই প্লেগদুষ্ট স্থানে অধিককাল থাকা যুক্তিসঙ্গত নয় ভাবিয়া, মনোমোহন ও প্রবোধকুমার স্বদেশ যাইবার জন্য দিগম্বরবাবুকে জানাইলেন। দিগম্বরবাবুরও কিছু দিনের জন্য বাটী যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তিনি, মনোমোহন ও প্রবোধকুমারের কথা শুনিয়া বলিলেন—"বাপু! আমারও তোমাদের সহিত বাটী যাইবার ইচ্ছা আছে; অতএব আর একদিন মাত্র বিলম্ব কর, তাহা হইলে আমরা সকলেই একত্রে বাড়ী যাইব।"

যদিও মনোমোহন ও প্রবোধকুমারের কার্য্য সমাধা হইয়াছিল, তথাপি তাহারা ব্রাহ্মণের অনুরোধে আর একদিন অপেক্ষা করিলেন। দিগম্বরবাবু পরদিন বাটী যাইবেন স্থির করিয়া, যাহা কিছু কাজকর্ম্ম বাকী ছিল, রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত তৎসমুদয় সমাধা করিয়া লইলেন। দুই প্রহরের পর আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। শেষ রাত্রে হঠাৎ তাঁহার একবার ভেদ ও বমি হইল; ব্রাহ্মণ মনে করিলেন—অধিক রাত্রি জাগরণ হেতু পরিপাকশক্তির ব্যাঘাত হইয়া এরূপ হইয়াছে, পরন্তু তাহা নহে; দেখিতে দেখিতে আরও দুই তিন বার ভেদ ও বমি হইল। দিগম্বরবাবু এইবার বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, হস্তপদ শিথিলভাবাপন্ন হইয়া ঘোর যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। মনোমোহন বড়ই ভীত হইলেন। রজনী প্রভাত হইলে তিনি দিগম্বরবাবুর পুরাতন কর্ম্মচারী রাধানাথকে ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন—নিকটেই একজন কবিরাজ আছেন—তাঁহাকেই ডাকিয়া আনি। প্রবোধকুমার কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া বলিলেন"—না না, কবিরাজের দ্বারা এ রোগ সারিবে না। আমার ছোট পিসির ছেলে খুব ভাল ডাক্তার; তিনি বহুবাজারের কালীতলায় থাকেন; আমি ত কলিকাতার রাস্তা ঘাট চিনি না! আমাকে সঙ্গে করিয়া যদি তথায় লইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে আনিয়া ইহাঁর চিকিৎসা করাই।"

রাধানাথ স্বীকৃত হইলেন এবং মনোমোহনকে রোগার শুশ্রূষা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দুইজনে ডাক্তার ডাকিতে গমন করিলেন এবং ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ডাক্তার আনিয়া দিগম্বরবাবুর চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু শমন যাঁহার নিকটবর্ত্তী, ডাক্তারে তাহার কি করিবে! ডাক্তার রোগের চিকিৎসাই করিতে পারে—জীবের জীবন দানের ক্ষমতা নাই; মৃত্যু রোগের কি ঔষধ অদ্যাবধি সৃষ্টি হইয়াছে? ডাক্তার বাবু দেখিয়া শুনিয়া বাহিরে আসিয়া

বলিলেন—“অবস্থা বড় ভাল নয়; তবে এই ঔষধ খাওয়াও; যদি কিছু উপশম হয়, আমাকে সংবাদ দিও, পুনরায় আসিয়া ব্যবস্থা করিব।” এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। মনোমোহন বিশেষ সতর্কতার সহিত ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর যাবতীয় লক্ষণ ব্রাহ্মণের শরীরে পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। তখন মনোমোহন ও তাহার বন্ধু উভয়ে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগের যাতনা বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ হিমাঙ্গ হইতে লাগিল। দিগম্বরবাবু আপনার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া মনোমোহনের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন—“মনোমোহন! আমার আর কেহ নাই; তুমি বাটীর সকলকে দেখিও, আমি চলিলা-ম।” বহুকষ্টে ব্রাহ্মণ এই কয়েকটী কথা কহিয়া একবার দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিলেন, পরে স্থির নয়নে উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া যেন কিসের চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বে যেমন একবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, ব্রাহ্মণের জীবন-প্রদীপ চিরতরে নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বে যেন একবার জ্বলিয়া উঠিল—তাঁহার বদনমণ্ডল প্রফুল্লভাব ধারণ করিল—তৎপরে তিনি মনোমোহনের হস্ত আপনার হস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন—“মনোমোহন! আমার এই অসময়ে তুমি যেরূপ সেবা শুশ্রূষা করিলে—পুত্র হইয়া পিতার এরূপ সেবা কেহ করে না—আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ পরোপকারপরায়ণ হও; আমার পূর্ব্বের কথাটী ভুলিও না—যাহাতে আমার পরিবারবর্গের কোন কষ্ট না হয়—তাহার তত্ত্বাবধারণ করিবে—বিষয় সম্পত্তির তুমিই সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া সৎপথে ব্যয় করিবে; তোমার বুদ্ধিশক্তি অতীব প্রখর, তুমি যথার্থ ধার্ম্মিক পিতার উপযুক্ত পুত্র বলিয়া তোমাকে এই সকল ভার দিয়া যাইতেছি। আর একটী কথা, আমার কন্যাটীকে দেখিও; আর ব্রাহ্মণীকে বলিও, আমি চলিলাম, পরলোকে আবার দেখা হইবে।” এই কথা বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। নিষ্ঠাবান দিগম্বর এইবার চক্ষু মুদিয়া পরকালের চিন্তা করিতে লাগিলেন, সে চক্ষু আর উন্মীলিত হইল না। মনোমোহন দেখিলেন—ব্রাহ্মণ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি তিনি নাসিকা বক্ষস্থল প্রভৃতি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, সমস্তই নিস্পন্দ; জীবনের আর কোন চিহ্নমাত্র নাই। পিতার বাল্যবন্ধু দিগম্বরবাবুর মৃত্যুতে মনোমোহন অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন কিন্তু মৃত্যুর হস্ত অতিক্রম করা কাহার সাধ্য নাই মনে করিয়া, আপনি প্রবুদ্ধ হইলেন এবং যথানিয়মে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

রাধানাথ, দিগম্বরবাবুর বহুদিনের পুরাতন কর্ম্মচারী, কিন্তু তাঁহার ন্যায় বিশ্বাসী লোক অধুনা প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না; এই জন্য দিগম্বরবাবু তাঁহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন, এমন কি, রাধানাথ ব্রাহ্মণের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিলেন; তিনি তাঁহার গৃহিণীকে জননী সম্বোধন করিতেন ও ব্রাহ্মণের মৃত্যুতে বড়ই অধৈর্য্য হইলেন এবং ব্যাকুলতা সহকারে বলিলেন—মহাশয়! আমাদের কি সর্ব্বনাশই হইল; হায়! এই ভয়ানক সংবাদ আমার মাতাঠাকুরাণী শুনিলে কি জীবিত থাকিবেন! তিনি কর্ত্তার পদধৌত জল প্রত্যহ না খাইয়া জলগ্রহণ করিতেন না—বাবুর যে দিন বাটী যাইবার কথা থাকিত, সে দিন নিয়মিত সময়ের একটু বেশী হইলে, মা আমার ছটফট করিতেন। তাঁহার ভগ্নী যে দাদাগত প্রাণ; বিশেষতঃ আমরা বাটী যাইলে যখন তাঁহার কন্যা আসিয়া বলিবে, দাদা! তুই এলি, বাবা কোথা? তখন তাঁহাকে কি বলিয়া বুঝাইব। এই বলিয়া রাধানাথ পিতৃহীন বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। মনোমোহন ও প্রবোধকুমার পরোপকারী ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের শোকে অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাঁদিয়া আর কি হইবে—দুরন্ত কৃতান্ত যাহাকে একবার উদরসাৎ করিয়াছে—তাহাকে কি আর ফিরিয়া পাইবার আশা আছে; মানবের অশ্রুজলে কি কৃতান্তের পাষাণ-হৃদয় দ্রবীভূত হয়? যাহা গিয়াছে—তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না; জন্ম মৃত্যু জগতের চিরন্তন নিয়ম; এখানে আসিলে যাইতেই হইবে—তাহার অন্যথা হইবার নয়। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহারা মনকে প্রবোধ দিলেন এবং সেই দিন বাসায় চাবি বন্ধ করিয়া বৈকালের গাড়ীতেই সকলে স্বদেশযাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

স্বামীর শোক।

দিগম্বরবাবু ঔর্দ্ধদৈহিকক্রিয়া সমাধা করিয়া, মনোমোহন, প্রবোধকুমার ও রাধানাথ রাত্রি প্রায় দশটার সময় ত্রিবেণীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। প্রবোধকুমার সেদিনকার মত নিজ বাটীতে প্রস্থান করিলেন। রাধানাথও প্রভুর বাটীতে না গিয়া মনোমোহনদের বাটীতেই আহারাদি করিলেন। মনোমোহনের পিতামাতা, তাঁহাদের পরমাত্মীয় দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকস্মাৎ মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। রাধানাথ সে দিবস তথায় রাত্রি যাপন করিলেন,

শোকে দুঃখে সে দিন তাঁহাদের কাহারও নিদ্রা হইল না। মনোমোহনদের বাটীর সন্নিকটেই দিগম্বরের বাটী কিন্তু মনোমোহন অদ্যাবধি তাঁহাদের কোন সংবাদ জানিতেন না, কারণ তিনি গ্রামে কাহারও বাটী যাইতেন না বা কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতেন না; তিনি নিজের কাজকর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন; গ্রামের খবর রাখিবার তাঁহার সময় কোথায়?

মনোমোহন রাধানাথকে দিগম্বরবাবুর বাটীসংক্রান্ত অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাঁহার বাটীতে কে কে আছে, কন্যাটীর বয়স কত এবং তাহার নাম কি, ইত্যাদি নানা প্রকার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাধানাথ বলিতে লাগিলেন,—"মহাশয়! বাবুর বাটীতে তাঁহার বিধবা ভগ্নী—ভবানী, সহধর্ম্মিণী—দুর্গাবতী ও একমাত্র আদরের কন্যা "রমা" বই আর কেহ নাই।"

মনোমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন,—কন্যাটীর বয়স কত?

রাধানাথ বলিলেন,—কন্যাটীর বয়স আন্দাজ আট বৎসর, রূপেগুণে সাক্ষাৎ দেবী; এই অল্প বয়সেই তাহার সাংসারিক অভিজ্ঞতা দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়; আহা! ভগবান এই অল্প বয়সেই তাহাকে পিতৃহীন করিলেন। এই বলিয়া প্রভুভক্ত রাধানাথ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইলেন। রজনীযোগে তাঁহাদের মধ্যে আর কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। পরে রজনী প্রভাত হইলে, সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া, রাধানাথ মনোমোহনকে বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি কি আমার সহিত বাবুর বাটীতে যাইবেন?"

মনোমোহন বলিলেন,—তুমি অগ্রে যাও; আমি আহারাদি করিয়া পিতার সহিত তোমার প্রভুর বাটীতে যাইয়া সকলকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা করিয়া আসিব।

রাধানাথ।—যে আজ্ঞা! তবে একটু সকাল সকাল আসিবেন; নতুবা আমি কোন প্রকারেই তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে পারিব না। এই বলিয়া রাধানাথ চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার যাইবার ক্ষমতা কোথায়? পদ হইতে পদান্তর যাইতে না যাইতে তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া পড়িতেছে। আহা! কেমন করিয়া তিনি এই ভয়ানক দুঃসংবাদ তাঁহার কর্ত্রীঠাকুরাণীকে শুনাইবেন, আর এ বজ্রসমবাণী শ্রবণ করিয়া তিনি যে কি করিবেন—আত্মহত্যা করিবেন, কি বিষ খাইবেন—তাহার ত স্থিরতা নাই। হায়! কেমন করিয়া বালিকা রমাকে বুঝাইব। যখন সে আমাকে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিবে এবং বাবা কোথা, জিজ্ঞাসা করিবে, তখন আমি তাহাকে কি বলিব? রাধানাথ যাইতে যাইতে এই

সকল বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভাবিলে আর কি হইবে। যখন আসিয়াছি, তখন ত বলিতেই হইবে। রাধানাথ নিতান্ত বিষণ্নচিত্তে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

প্রিয়জনের মৃত্যু-সংবাদ শুনাইতে হয় না। মৃত্যুর পর নিকটে না থাকিলেও যেন তাহা মনের ভিতুর আপনাআপনি উদিত হইয়া যন্ত্রণা প্রদান করে। কমলা প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যেন সকল দিকে অমঙ্গলের চিহ্ন সকল দর্শন করিতে লাগিলেন, শরীর যেন কিরূপ অবসন্ন ভাব ধারণ করিল—প্রাণ যেন সহসা কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি দুর্গানাম স্মরণ করিয়া গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন; কিন্তু কোন কাজ-কর্ম্মই আজ যেন তাঁহার মনোমত হইতেছে না—সাংসারিক কাজকর্ম্ম আজ যেন তাঁহার আদৌ ভাল লাগিতেছে না। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহার কোন কারণ স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি কন্যাকে নিকটে ডাকিয়া খাবার খাওয়াইতে বসিলেন, যদি স্নেহের পুতুলিটীকে নিকটে দেখিলে তাঁহার মানসিক ভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হয়। কন্যা রমা, জননীর নিকট আসিয়া খাবার খাইতে লাগিল। ভবানী এ সকল বিষয় কিছুই জানেন না—তবে তাঁহার মন প্রাতঃকাল হইতে কিরূপ শূন্যময় বোধ হইতেছিল, তিনি কাহারও নিকট কিছুই প্রকাশ করেন নাই। দুর্গাবতী কন্যাকে নিকটে বসাইয়া নিজের মনকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তাহাকে কত সুমিষ্ট কথা বলিতেছেন। এমন সময়ে একটা বায়স কর্কশ শব্দ করিয়া, তাঁহার মস্তকের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, দক্ষিণচক্ষু বার বার স্পন্দিত হইতে লাগিল। নিশ্চয় কোন দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, মনে করিয়া তিনি শ্যামাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—তখন ভবানীও নিজের চিত্তচাঞ্চল্যের কথা প্রকাশ করিল। এবং বলিল—আজই একজন লোককে কলিকাতায় পাঠাইতে হইবে। রমা বালিকা, তাহার মস্তকে যে বিধাতা বজ্রাঘাত করিয়াছেন, তাহা সে এখনও জানিতে পারে নাই, তাই সে জননীর নিকট খাবার খাইয়া সঙ্গীগণের সহিত বহির্ব্বাটীতে খেলা করিতে গমন করিল। দিগম্বরবাবুর বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গনে আরও কয়েক জন সমবয়স্কা বালিকার সহিত রমা খেলা করিতে আরম্ভ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাধানাথ আসিয়া বহির্ব্বাটীর দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, এমন সময়, বাবুর বাল্যবন্ধু বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় তথায় আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। রাধানাথ, হৃদয়ে একটু বল পাইলেন, পরে উভয়ে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণের আট বৎসর বয়স্কা কন্যা, কাদম্বিনী মাঝে ক্ষণপ্রভার ন্যায়, নানাবিধ ক্রীড়া-তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। নিকটে একজন দাসী দাঁড়াইয়া তাহাদের ক্রীড়া কৌতুক দর্শন করিতেছে এবং সেও তাহাদিগকে অনেক প্রকার নূতন ক্রীড়া শিক্ষা দিতেছে। এমন সময় বিষ্ণুরাম ও রাধানাথ তথায় আসিয়া উপস্থিত। রমা এতক্ষণ দেখিতে পায় নাই; এইবার রাধানাথকে দেখিতে পাইয়া সে দৌড়িয়া আসিল এবং তাহার কোলে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তুই এলি, বাবা কখন আস্‌বে?" রাধানাথ নীরব, সে কি উত্তর দিবে খুঁজিয়া পাইল না, কাঁদিয়া ফেলিল। দাসী তাঁহার ক্রন্দনের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া, "বাবা গো—কি হলো" বলিয়া চীৎকার স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। বাটীর ভিতর আর এ সংবাদ প্রদান করিতে হইল না—সংবাদ আপনা হইতে পূর্ব্বেই পৌঁছিয়াছে, তবে, স্বরূপ না দেখিলে অমঙ্গল চিন্তা করা যায় না—এইজন্য সকলে অপেক্ষা করিতে লাগিল। দাসীর ক্রন্দন এবং রাধানাথকে তদবস্থ দেখিয়া শ্যামাসুন্দরী ভ্রাতার শোকে অধীর হইয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

দুর্গাবতী এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন—কল্য তাঁহার পতির মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া—"হা নাথ! তুমি কোথায় গেলে? তোমার বিহনে এখনও আমার প্রাণ দেহ ছাড়া হইল না?" বলিয়া বৃক্ষচ্যুত লতিকার ন্যায় ভূতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন; ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিতা হওয়ায় চেতনা বিলুপ্ত হইতে লাগিল।

প্রতিবাসী স্ত্রীলোকেরা দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে আকস্মিক ক্রন্দনের রোল শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল এবং গৃহস্বামীর মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া, সকলে যারপরনাই দুঃখিত হইয়া হা-হুতাশ করিতে লাগিল। অনেক যত্নে পতিপ্রাণা দুর্গাবতীর মূর্চ্ছাপনোদন করা হইল। মূর্চ্ছান্তে তিনি কপালে ও বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া অশেষবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই শোকবাক্য শ্রবণ করিলে অতি বড় পাষাণ হৃদয়ও শোকার্দ্র হয়। দুর্গাবতীর এখন উন্মাদ অবস্থা, তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় কত প্রকার ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কখন বা দ্রুতপদে পার্শ্বস্থ কূপে ঝম্প প্রদান করিতে অগ্রসর হন, কখন বাতাহত তরুর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দেন। আর রমা!—সে জননীর ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া কেবল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং সময়ে সময়ে "বাবা গো, তুমি কোথায় গেলে গো,

তোমা বিহনে মা'র আমার কি দুর্দ্দশা হলো গো" ইত্যাদি বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। আজ, চিরানন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শোক-স্রোতে ভাসিতে লাগিল। পতিগতপ্রাণা দুর্গাবতীর এই ভয়ানক অবস্থা দেখিলে বাস্তবিক মর্ম্মদাহ উপস্থিত হয়।

আহা! প্রণয়ী-যুগল যেন একবৃন্তে দুইটী ফুল! কালের কঠিন তাড়নে একটী ঝরিয়া পড়িলে,—আর একটীর অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়,—তাহার সে সৌন্দর্য্যরাশি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়, আর যেন তাহার দিকে তাকাইতে ইচ্ছা হয় না—প্রাণ যেন কাঁদিয়া উঠে, মন যেন বিষাদ-বিষে জর্জ্জরিত হয়। পতিবিয়োগে পত্নীর যে দশা হয়, তাহার কষ্ট, তাহার শোক, তাহার মর্ম্মযাতনা কি লেখনী দ্বারা লিখিয়া বর্ণনা করা যায়? তাহা প্রণয়ী ভিন্ন আর কাহারও অনুভব করিবার ক্ষমতা নাই। ভগবান! তুমি দয়ার নিদান—মানবের মঙ্গলের জন্য প্রণয়ের সৃষ্টি করিয়াছ। পতিপত্নীকে একত্র করিয়া তুমি সেই প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাক। তবে কেন দেব! এমন সুখ সংযোগের পর, আবার এই ভয়ানক বিয়োগের সৃষ্টি করিলে! অসহ্য যম-যাতনায় কেন আবার দুর্গাবতীর হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন করিলে?—ইহা দেখিয়া কি তোমার সুখ হয়—দয়াময়? না না, ভাগ্যবিধাতা! ইহাতে তোমার দোষ কি, যাহার ভাগ্য যেরূপে গঠিত হইয়াছে—সে সেইরূপ ফলভোগ করিবে। কিন্তু মর জগতবাসী আমরা! এ দৃশ্য—এ শোকদৃশ্য দেখিলে, আমাদের দুর্ব্বল হৃদয় একেবারে অধীর হইয়া পড়ে—মনে হয়, এই ত জগতের পরিণাম; এই ত সুখ, এই ত সংসার—কালের কুটিল কটাক্ষে এক মুহূর্ত্তে এই সোনার সংসার শ্মশান হইয়া গেল। ক্রমশঃ।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আত্মপূজা।

(শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের লিখিত মূল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল।)

আনন্দে সচ্চিদানন্দে নির্ব্বিকল্পৈকরূপিণী।
স্থিতের্দ্বিতীয়াভাবে বৈ কথং পূজা বিধীয়তে ॥ ১ ॥

আনন্দস্বরূপ, সচ্চিদানন্দ, বিকল্পবিরহিত, একরূপ পরব্রহ্মে দ্বিতীয়ের অভাব প্রযুক্ত স্থিতি হেতু ' [illegible] কারে পূজা করা যাইতে পারে। ১ ॥

পূর্ণস্যাবাহনং কুত্র সর্ব্বাধারস্যচাসনং।
স্বচ্ছস্য পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ শুদ্ধস্যাচমনং কুতঃ॥ ২॥

পূর্ণস্বরূপ পরমপদার্থের আবাহন কোথায়? নিখিল বস্তুর আধারস্বরূপ পদার্থের আসন কোথায়? স্বচ্ছপদার্থের পাদ্য এবং অর্ঘ্য কোথায়? এবং পরম পরিশুদ্ধ পদার্থের আচমনই বা কোথায়? ২॥

নির্ম্মলস্য কুতঃ স্নানং বস্ত্রং বিশ্বোদরস্য চ।
নিরালম্বস্যোপবীতং রম্যস্যাভরণং কুতঃ॥ ৩॥

সুনির্ম্মল পদার্থের স্নান কোথায়? বিশ্বোদরের বস্ত্র কোথায়? অবলম্বন বিরহিত বস্তুর উপবীত কোথায়? এবং মনোহর পদার্থের আভরণ কোথায়? ৩॥

নির্লেপস্য কুতোগন্ধঃ পুষ্পং নির্ব্বাসনস্য চ।
নির্গন্ধস্য কুতোধূপঃ স্বপ্রকাশস্য দীপিকা॥ ৪॥

নির্লিপ্ত পদার্থের চন্দন কোথায়? বাসবিহীন বস্তুর পুষ্প কোথায়? গন্ধবিহিনের ধূপ কোথায়? এবং স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় পরম পদার্থের দীপ কোথায়? ৪॥

নিত্য তৃপ্তস্য নৈবেদ্যং নিষ্কামস্য ফলং কুতঃ।
তাম্বূলঞ্চ বিভোঃ কুত্র নিত্যানন্দস্য দক্ষিণা॥ ৫॥

নিত্য তৃপ্তিযুক্তের নৈবেদ্য কোথায়? নিষ্কামের ফল কোথায়? সর্ব্বস্থানগত প্রভুর তাম্বূল কোথায়? এবং নিত্য আনন্দময়ের দক্ষিণাই বা কোথায়? ৫॥

স্বয়ং প্রকাশমানস্য কুতোনীরাজনাবিধিঃ।
প্রদক্ষিণ মনন্তস্যাদ্বিতীয়স্য চ কা নতিঃ॥ ৬॥

স্বয়ং প্রকাশমান পদার্থের নীরাজনবিধি কোথায়? অনন্ত পদার্থের প্রদক্ষিণ কোথায়? এবং অদ্বিতীয়ের অভিবাদনই বা কোথায়? ৬॥

অন্তর্ব্বহিশ্চ পূর্ণস্য কথং মুদ্রাসনং ভবেৎ।
ইদমেব পরা পূজা বিষ্ণোঃ সত্ত্বস্বরূপিণী॥ ৭॥

অভ্যন্তর এবং বাহ্য এই উভয় পরিপূর্ণ রূপের মুদ্রার বিধান কিরূপে হইতে পারে? অতএব ইহাই বিষ্ণুর পরমা সাত্ত্বিকী পূজা॥ ৭॥

দেহো-দেবালয়ঃ প্রোক্তো জীবো—দেবঃ সদাশিবঃ।
ত্যজেদজ্ঞান নির্ম্মাল্যং সোঽহংভাবেন পূজয়েৎ ॥ ৮ ॥

এই দেহই দেবালয় স্বরূপে উক্ত হয় এবং তাহার মধ্যে জীব সদাশিবরূপ দেবতা হন; অতএব, অজ্ঞানস্বরূপ নির্ম্মাল্য পরিত্যাগ করতঃ 'আমিই পরব্রহ্ম' এইরূপ ভাবে পূজা করিবে ॥ ৮ ॥

তুভ্যং মহ্যমনন্তায় মহ্যং তুভ্যং শিবাত্মনে।
নমো দেবাদিদেবায় পরায় পরমাত্মনে ॥ ৯ ॥

তুমি এবং আমি অনন্ত, এবং আমি ও তুমি শিবস্বরূপ; অতএব, দেবাদিদেব পরম পুরুষ পরমেশ্বর পরমাত্মাকেই প্রণাম ॥ ৯ ॥

যোগী দেহাভিমানীস্যাদ্ ভোগী কর্ম্মণি তৎপরঃ।
জ্ঞানী মোক্ষাভিমানেব তত্ত্বজ্ঞে নাভিমানিতা ॥ ১০ ॥

যিনি যোগী, তিনি দেহাভিমানী হন; যিনি ভোগী, তিনি নিরন্তর কর্ম্মরত হন; যিনি জ্ঞানী, তিনি মোক্ষাভিমানী হন; কিন্তু যিনি প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী, তিনি কোন বিষয়েই অভিমানী হন না। ১০ ॥

কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কিং গৃহ্লামি ত্যজামি কিং।
আত্মনা পূরিতং সর্ব্বং মহাকল্পাম্বুনা যথা ॥ ১১ ॥

মহাপ্রলয়কালে অনন্ত জলরাশি দ্বারা যে প্রকার সমগ্রবিশ্ব পরিব্যাপ্ত হয়, আত্মা-দ্বারা সেইরূপ এই নিখিল-বিশ্ব-চরাচর পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। অতএব কি করিব? কোথায় যাইব? কি গ্রহণ করিব? এবং কি বা পরিত্যাগ করিব? কি কর্ত্তব্য এবং কি-ই বা অকর্ত্তব্য, তাহা কিছুই দেখি না। কিছুই দেখি না;—দেখি কেবল অদ্বিতীয়আত্মা মাত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ ১১ ॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ।

বর্ষান্তে শরৎ।

জলদ উপরি জলদ উঠিয়া
আকাশ ছাইল, ঢাকিল রবি।
আঁধারে আঁধারে ঢাকিল গগন,
ঢাকিল মেদিনী—মোহন ছবি।

বহিল সবলে পুরব বাতাস,
ছিঁড়িল লতিকা, ভাঙ্গিল তরু।
ভাঙ্গিয়া পড়িল বড় বড় ঘর,
উড়িল মানুষ, উড়িল গরু।

দড় বড়ি করি বরষিল শিলা,
ভাঙ্গিয়া পড়িল গৃহের ছাদ।
মুষল ধারায় বরষিল বারি,
ভরিল সরসী, ভরিল খাদ।

নয়ন ধাঁধিয়া বিজলি খেলিল,
গুরু-গরজনে কাঁপিল ধরা।
শত শত বাজ পড়ি পড়ি কত
সংসার ভাঙ্গিল, যে ছিল ভরা।

আসিয়া বরষা কত কি করিল;
হিমাদ্রি ভাঙ্গিতে বড়ই সাধ।
আছিল যেমন, তেমনি রহিল,
ভাঙ্গিল কেবল নিজের বাঁধ।

হাসি হাসি মুখে আসিয়া শরৎ
বরষা ঋতুরে বিদায় দিল।
চলিল মলিন বদনে বরষা
ভরসা যা ছিল সকলি গেল।

এ চিত্র দেখায়ে, সেই চিত্রকর
কি বুঝায়, বুঝ, ভগিনীগণ।
পাইলে প্রভুত্ব ভুলেরে মানব,
না বুঝি' পীড়নে করেরে পণ॥

শ্রীমতী জগদীশ্বরী দেবী।

তান্ত্রিকাচারে প্রতিমাপূজা।

বর্ত্তমান কালে বঙ্গদেশে বৈদিক ও তান্ত্রিক মতে অনেক দেবদেবীর পূজা হইয়া থাকে। পুরাকালে রাজর্ষি সুরথ ও বৈশ্যবর সমাধি, মেধস মুনির নিকট মহামায়া ভগবতীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া মৃণ্ময়ী মহিষমর্দ্দিনীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক উহার পূজা করিয়াছিলেন। কিন্তু, ঐ পূজা কোন্ সময়ে কি মাসে হইয়াছিল তাহার কোন উল্লেখ নাই। কিছুকাল পরে শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে মহিষমর্দ্দিনী ভগবতীর পূজা করিয়া, তাঁহার বরে রাবণ বধ করিয়াছিলেন। শ্রীরাম শরৎকালে পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া বঙ্গদেশীয় আর্য্যসন্তানগণ আজ পর্য্যন্ত মহাসমারোহে শারদীয় মহাপূজার অনুষ্ঠান করিতেছেন। ৪ শত বৎসর পূর্ব্বে এতৎ প্রদেশে কালী তারা প্রভৃতি তান্ত্রিক প্রতিমা ও উহার

পূজার পারিপাট্য বিশেষরূপ ছিল না। যাঁহারা গৃহস্থবৈষ্ণব তাঁহারা "নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই পুরাণোক্ত প্রণবযুক্ত দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, কেহ কেহ প্রস্তরময়ী বাসুদেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক উহার আরাধনা করিতেন। একখণ্ড প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ, বামে সরস্বতী, দক্ষিণে লক্ষ্মী, মধ্যে পদ্মের উপর দণ্ডায়মান শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিই বাসুদেবমূর্ত্তি। বর্ত্তমান সময়ে, এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা বা পূজা প্রায় দেখা যায় না। কোন কোন জীর্ণ দেবালয় হইতে, বা কখন কখন পুষ্করিণ্যাদি খনন করিতে করিতে এই মূর্ত্তি উত্থিত হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর হইল, জেলা রঙ্গপুরের কোন এক ময়দানে রাখালেরা মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে দুইটী মূর্ত্তি পাইয়াছিল। একটী বাসুদেব ও অপরটী শক্তি; মূর্ত্তিদ্বয়ের নিম্নভাগে কয়েক ছত্র লিখিত আছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত উহার পাঠোদ্ধার হয় নাই। অক্ষরের আকার দেখিলে বোধ হয়, উহা পালবংশীয় রাজগণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। বোধ হয়, যিনি স্থাপিত করিয়াছিলেন তাঁহারই নাম, ধাম ও সময় লিখিত আছে। এই বাসুদেব মূর্ত্তি আরও অনেক স্থান হইতে উত্থিত হইয়াছে। উহাদের বিশেষ বিষয় পরে প্রকাশ করিব।

১৪০৭ শকাব্দে চৈতন্যদেব নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া যখন বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিতে লাগিলেন, তখন বঙ্গদেশীয় অধিকাংশ লোক তাঁহার উপদেশে রাধাকৃষ্ণের পূজা ও যুগলমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা আরম্ভ করিতে লাগিল। সুতরাং, প্রাচীন বাসুদেবাদি মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ক্রমে লোপ হইয়া গেল। ঐ সময়ে মহেশ্বর গৌড়াচার্য্য নামক একজন বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত মণ্ডলজানি গ্রাম হইতে নবদ্বীপে আসিয়া গঙ্গাস্নান উপলক্ষে বাস করেন। তাঁহার দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ, কনিষ্ঠ মাধবানন্দ। কৃষ্ণানন্দ, চৈতন্যের সমসাময়িক লোক, উভয়েই বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র। কৃষ্ণানন্দ আগমশাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন বলিয়া আগমবাগীশ উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং বৃহৎ তন্ত্রসারাদি কতিপয় তন্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বর্ত্তমানকালে তন্ত্রসার নামক যে গ্রন্থ প্রচলিত আছে, উহা এই মহাত্মাকর্ত্তৃকই সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্গদেশে কার্ত্তিকমাসে দীপান্বিতা অমাবস্যার নিশাতে যে শ্যামাপূজা হইয়া থাকে, সেই শ্যামামূর্ত্তি ও উহার পূজাপদ্ধতি এই আগমবাগীশেরই আবিষ্কৃত। পুরাকালে সাধকগণ তান্ত্রিক দেবদেবীর পূজা প্রায় ঘটস্থাপন করিয়াই সম্পন্ন করিতেন। মূর্ত্তি প্রকাশের পর হইতে সাধকগণ ঘট ও মূর্ত্তি উভয়

স্থাপিত করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। কথিত আছে আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য ইষ্টদেবতা কালীর মূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়া, পূজা করিতে মানস করিলেন, কিন্তু তন্ত্রোক্ত ধ্যানানুসারে বরাভয় হস্ত কিরূপে গঠিত হইবে এবং ভ্রূদ্বয়ই বা কি রঙ্গে রঞ্জিত হইবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তিত হইলেন। তাঁহাকে এইরূপ চিন্তাযুক্ত দেখিয়া ইষ্টদেবী স্বপ্নাবস্থায় এই প্রত্যাদেশ দিলেন যে, তুমি কল্য প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া যে মূর্ত্তি দেখিবে, তাহাতেই আমার বরাভয়কর ও ভ্রূদ্বয়ের বিষয় জানিতে পারিবে। পরদিন কৃষ্ণানন্দ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া যেমন বাটী হইতে বহির্গত হইলেন, অমনি দেখিলেন যে, এক কৃষ্ণবর্ণা গোপ-রমণী দক্ষিণ পদ অগ্রবর্ত্তী করিয়া গৃহের ভিত্তি-সন্নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া, বাম হস্তস্থিত গোময় পিণ্ড হইতে দক্ষিণ হস্তে অল্লাংশ গোময় লইয়া ভিত্তিগাত্রে প্রক্ষেপ করিতেছে। পরিশ্রম বশতঃ, তাহার মুখমণ্ডল হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হওয়ায় এবং অনুত্তান হস্তে ললাটের ঘর্ম্ম মোচন করায়, ললাটস্থ সিন্দূর বিন্দু দ্বারা ভ্রূযুগল লোহিতরূপ ধারণ করিয়াছে। মস্তকের বস্ত্র পতিত ও কেশ-কলাপ আলুলায়িত হইয়াছে। এমন সময়ে কৃষ্ণানন্দ তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। গোপরমণী স্বভাব-সুলভ লজ্জাবশতঃ দন্তে জিহ্বা কাটিলেন। কৃষ্ণানন্দ এই মূর্ত্তি দেখিয়া বরাভয়করাদির বিষয় স্থির করিয়া লইলেন, এবং তদবধি রাত্রিতে নিত্য ঐ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া, পূজান্তে, রাত্রিতেই বিসর্জ্জন দিতেন। এই জন্য, অস্মদ্দেশে যে সকল কার্য্য হঠাৎ হইয়া থাকে, তাহাকে আগমবাগীশীকাণ্ড বলিয়া থাকে। কৃষ্ণানন্দের এই পূজা সাত্ত্বিক-ভাবে হইত। পশুহিংসা বা কোন মাদক দ্রব্যের সংশ্রব ছিল না। আগম-বাগীশের এই মূর্ত্তি প্রকাশিত হওয়ার পর হইতেই, বঙ্গদেশে শ্যামাপূজা পদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্যাপি আগমবাগীশের বংশধরেরা ঐ মূর্ত্তি পূজা করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে নবদ্বীপে ১০।১২ হাত লম্বা এক প্রকাণ্ড শ্যামামূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে। আগমবাগীশ কর্ত্তৃক ঐ মূর্ত্তি ও পূজা-পদ্ধতি প্রকাশিত বলিয়া, ঐ মূর্ত্তি "আগমেশ্বরী" নামে খ্যাত। আগমবাগীশের বংশধরগণ নবদ্বীপ, শান্তিপুর, ঘুরণি, দামপাল, বনহুগলী ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। উহাঁরা পূর্ব্বপুরুষের রীত্যনুসারে, শ্যামাপূজা সাত্ত্বিক মতে করিয়া থাকেন। শ্যামাপূজা আধুনিক বলিয়া বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক স্মার্ত্ত মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, তাঁহার নিজ গ্রন্থে ঐ পূজা সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ করেন নাই, এবং সম্ভবতঃ এই

কারণেই ঐ মূর্ত্তির পূজা পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় দেখা যায় না। আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক উক্ত মূর্ত্তি প্রকাশ হওয়ার কিছুকাল পরে জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত পণ্ডিতবাড়ী গ্রামে দ্বিজদেব নামক এক ব্রাহ্মণের প্রতি জগদম্বার এই প্রত্যাদেশ হয়।

"ফলেঃশ্চত্তঃ সহস্রাব্দে, গতে সপ্তশতোত্তরে। গৌরমর্দ্ধং তনোরর্দ্ধ-মপরং শ্যামল প্রভং ॥ রূপমেতৎ সমাদায় বিহরিষ্যে তবালয়ে ॥"

অর্থাৎ, কলির চারিহাজার সাত শত বৎসর গত হইলে, অর্দ্ধ গৌরবর্ণ ও অর্দ্ধ কৃষ্ণবর্ণ এই রূপ গ্রহণ করিয়া, তোমার গৃহে অবতীর্ণ হইবে। ইহার কিছু কাল পরে, দ্বিজদেবের ঐরূপ একটি কন্যা জন্মিল। কন্যা, বিবাহযোগ্যা হইলে, বিকৃতরূপ বলিয়া, প্রথমে কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইল না। অবশেষে, কথিত আছে, মিজকা নিবাসী রাঘবদেব নামক দ্বিজদেবের এক ছাত্র ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ঐ কন্যার গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মিল, তাহারা অর্দ্ধ কালীর সন্তান বলিয়া বিখ্যাত। এই অর্দ্ধ কালীর সন্তান-গণ পূর্ব্ববঙ্গে শিষ্যপরম্পরায় তান্ত্রিকাচার প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহারাও প্রথমে সাত্ত্বিকভাবে দেবীর আরাধনা করিতেন, পশুহিংসা বা মাদক দ্রব্যের কখন প্রশ্রয় দিতেন না।

কালক্রমে পঞ্চমকারাদি দ্বারা নিকৃষ্ট উপাসনা প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য প্রণীত বিশুদ্ধ তান্ত্রিক পূজা পদ্ধতি ক্রমশঃ কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমশঃ।

শ্রীঅজিতনাথ ন্যায়রত্ন।
নবদ্বীপ।

মক্কাতীর্থ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আব্‌দ মতলব।

আব্‌দ মতলব, সদ্বিদ্বান ও প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। তিনি বহু-কালের শুষ্ক 'জম্‌জম্‌' নামক স্বনামখ্যাত কূপটীর সংস্কার করিয়া, মক্কার জলাভাব দূর করেন। তাঁহার দ্বারা মক্কার অনেক বিষয়ে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিলে, তৎপুত্র তত্ত্বজ্ঞানী আব্দুল্লা মক্কার কর্তৃত্ব লাভ করেন। এই মহাভাগই আমাদের হজরতের পিতৃদেব।

যৎকালে মহাপুরুষ এব্রাহিম (আঃ) প্রভৃতির প্রেরিত পুরুষদিগের প্রচারিত নির্ম্মল ধর্ম্মনীতি লাঞ্ছিত ও বিকৃত হইয়া পৌত্তলিকতায় মক্কানগরী অমানিশার তামসী ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল; যখন সুচারু কারুকার্য্য বিশিষ্ট ধর্ম্ম মন্দির "ঞিয়াতুননমলে" (বল্মীকে) পরিণত হইয়াছিল; যে সময় 'মতায়র-রব'গণ কুসংস্কারাপন্ন এবং অজ্ঞানতার অন্ধতমসে দিগভ্রষ্ট হইয়া ধর্ম্মমন্দিরকে অপূর্ব্ব প্রতিমাগার বা চিত্রশালায় পরিণত করিয়াছিল; যখন মক্কায় ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, কর্ম্মের নামে অকর্ম্ম, পুণ্যের নামে পাপ ব্যতীত নিত্যবর্ণনার বিষয় অন্য কিছুই ছিল না; সেই সময়েই শয়তানের উৎকট ক্রীড়াস্থলী মক্কায় দুরাসদতেজাঃ ধর্ম্মাবতার মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবে মক্কার ভাগ্য-গগন বালারুণরাগে সুরঞ্জিত এবং দিগুনিচয় সমুদ্ভাসিত হইতে লাগিল।

তৎকালে, ক্রমান্বয়ে জগতের যাহা কিছু পূজার্হ, পবিত্রতায় যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মগৌরবের যাহা কিছু অনুকূল, ভাগ্যৈশ্বর্য্য এবং সভ্যতা-ভব্যতার যাহা কিছু লীলারঙ্গ, সকলই মোস্লেম সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া, ইস্লামের সূতিকা-ক্ষেত্র মক্কানগরীকে পৃথিবীর সমগ্র জনপদের শীর্ষ-রত্ন করিয়া তুলিয়াছিল। পরম ভগবদ্ভক্ত মহাতপাঃ ঋষিগণ, সপ্রতিভ কোবিদবর্গ, বীরত্ব প্রভাব-সম্পন্ন বীরেন্দ্রকুল নানাদিগ্দেশ হইতে সমাগত হইয়া, ইহার সর্ব্ববিধ সংস্কারে বিভোর হইলেন, বিদুষী কোরেশ কামিনী কমলিনীবৃন্দ, ইহার শোভাসম্বর্দ্ধনের জন্য স্ব স্ব শক্তি নিয়োজিত করিলেন; পূতচরিত্র সদ্বিচারক শরিফগণ ইহাকে বৃত্তাকার বিশালায়তন প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত করিতে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহারা তদভ্যন্তরে নয়নাভিরাম মাদ্রাসা, উদ্যান ও পণ্যভূমি প্রভৃতিরও প্রতিষ্ঠা করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই।

সকলকার সমবেত উদ্যমে, উৎসাহে ও অধ্যবসায়ে, মক্কা অমরাবতীবিনিন্দী ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য লাভে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু, সার্দ্ধশতাধিক হিজরী অতিবাহিত হইতে না হইতেই, খলিফীয় পৌর বিগ্রহের ভীষণ পরিণামে মক্কার গৌরবগরিমা কালের বিধ্বংসী প্রবাহে ডুবুডুবু হইয়া পড়িল; প্রতাপ-বিভবময়ী ইস্লাম ধর্ম্মের বৈজয়িক অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত শুভ পতাকা জঘন্য মতভেদের শাণিত অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরীভূত হইল; সদ্বিচার ও কুসংস্কারের অসদ্ভাবে ধীরে ধীরে শান্তির স্থলে সর্ব্বত্র অশান্তি, সুখোচ্ছ্বাসের স্থলে ধ্বংসগীতি এবং কীর্ত্তির স্থলে অকীর্ত্তি আসন পরিগ্রহ করিল।

তৎকালে, আব্বাস বংশীয় খলিফাগণের প্রতাপ-মুকুট, সম্রাটকুল-শিরোমণি হারুণউল-রশিদের সহধর্ম্মিণী—বিশ্ববরণীয়া সম্রাজ্ঞী জোবেদা খাতুন, মক্কার সংস্কার সাধনে অনুপ্রাণিত হয়েন। তিনি দজ্জলা (টাইগ্রিস) নদী হইতে একটী পয়ঃপ্রণালী, খনন করাইয়া, আরফাত পর্ব্বতের তলদেশ দিয়া মক্কায় আনয়ন করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ প্রণালীর স্রোতোবর্দ্ধনের জন্য মাক্কাস্, মায়মুন, জীফরান, বরুদ, তারেক্কী, নকী ও জরিবাত নামক ৭টী সুনির্ম্মিত প্রপাত হইতে ৭টী উপ-প্রণালী প্রস্তুত করিয়া, তৎসঙ্গে সংযোজিত করা হইয়াছিল। প্রণালীটী দজ্জলানদী হইতে বহির্গত হইয়া, বক্রচক্রাকারে ত্বাদ্‌পর্ব্বত, হোনায়েন উদ্যান, রহমত পর্ব্বত, নওমান্ প্রান্তর, মাত্তিন, কেনায়া ও মজ্বাদালেফা প্রভৃতি স্থান দিয়া মক্কা স্থিত 'বীর-জোবেদায়' পতিত হয়। উহা খনন করিতে ১০ কোটী ৩ লক্ষ ১২ হাজার ৫ শত টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। প্রাতঃস্মরণীয়া জোবেদা খাতুন হেজ্জাজের দুর্ভেদ্য পর্ব্বতশ্রেণীর অভ্যন্তর প্রদেশ দিয়া, এই অপূর্ব্ব প্রণালী খনন করাইয়া, যে দেব-দুর্ল্লভ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন সর্ব্বজাতির হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ ও বিস্ময় উৎপাদন করিবে।

মহারাজ্ঞী জোবেদার জল-প্রণালী (নহরেজোবেদা) নির্ম্মাণের পর হইতে এবং তাৎকালীক খলিফার শাসননীতির নির্ম্মলতায়, মক্কার সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি হইয়াছিল। তাহাতে মক্কাবাসিগণ ৭৪৫ বৎসর পর্য্যন্ত নিরাপদে দিনপাত করিয়াছিলেন। অতঃপর হিজরী ৮২১ অব্দে 'নহরে জোবেদা' রুদ্ধ হওয়ায় ভীষণ জলকষ্টে, মক্কার অসংখ্য অধিবাসী মৃত্যু-কবলিত হয়; তজ্জন্য ক্রমান্বয়ে মিশরের শাসনকর্ত্তা সোলতান আশরফ, সম্রাট সোলেমান, মহারাণী মাহরো ও সোল্‌তান মোরাদ খান্ 'নহরে জোবেদার' সংস্কার করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সম্রাজ্ঞী মাহরোর সংস্কারকার্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহারাণী মাহরো ৯৬৯ হিজরীতে 'নহরেজোবেদার' সহিত একটী নূতন শাখা-প্রণালী সম্মিলিত করাইয়া ধন্যবাদার্হ হইয়া গিয়াছেন। তৎকার্য্যে ১০ বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। সোলতান মোরাদখানের সংস্কারের কিছুকাল পরে, ধর্ম্মপ্রাণ শরিফ আবুএজ্জে উচ্ছৃঙ্খল মক্কানগরীকে, চারিটী বৃহৎ সিংহদ্বার বিশিষ্ট সুদৃঢ় প্রস্তর-বিন্যস্ত প্রাচীর দ্বারা, পরিশোভিত করিয়াছিলেন। তাহার উত্তর দ্বার হইতে দক্ষিণ দ্বার ৪ হাজার ১৭ গজ এবং পূর্ব্বদ্বার হইতে পশ্চিম দ্বার ৪ হাজার ১ শত ৯ গজ ব্যবধান ছিল।

'ওম্মলক্কোরা' বা নগরী-কুল-জননী মক্কার মাহাত্ম্য অপরিসীম। সুপবিত্র কোরাণ শরীফে কীর্ত্তিত আছে যে, "নিশ্চয় প্রথম যে ধর্ম্ম মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা মক্কাস্থ কল্যাণযুক্ত জগতের পথ প্রদর্শক কাবা।" মহাত্মা এব্রাহিম—ধর্ম্মধাম প্রস্তুত হইলে, প্রত্যাদেশক্রমে আবুকবিশগিরি শিখরে আরোহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন যে, "হে বিশ্বাসিগণ, পরমেশ্বর তোমাদিগকে স্বীয় পুণ্যগৃহে ধর্ম্মানুষ্ঠান সংসাধনে আহ্বান করিতেছেন, সকলে বদ্ধপরিকর হও।" তৎকালে, আহ্বানধ্বনি শ্রবণে সকলে সমবেত হইয়া স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়েন। কালক্রমে, আরবীয় লোকেরা সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। সেই সময়, মহাভাগবত মোহাম্মদ মোস্তফা (দং) মক্কা-হৃদয়-সংস্থিত হেরা গুহা হইতে শূন্যপথে, হিরণ্ময় সিংহাসনে হজরত জেব্রাল (আং) কে দর্শন করেন, এবং 'পয়গম্বরী' (প্রেরিতত্ব) প্রাপ্ত হয়েন। মক্কা এস্‌লাম ও 'এমানের' প্রসবিত্রী, 'খোলাফায়ে রাশেদীন'-গণের জন্মস্থলী এবং 'হাজ্রারে আসোয়াদ' ও মোকাম এব্রাহিমআদির জন্য গৌরবান্বিতা। তজ্জন্য, প্রসিদ্ধ হাদিস সমূহে মক্কার ধর্ম্মানুষ্ঠানের পুণ্য অসামান্য বলিয়া প্রকীর্ত্তিত।

কাবাগৃহের চতুঃসীমার মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা, পশু-পক্ষী বধ করা, পতিত ধন গ্রহণ করা ইত্যাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দূষ্য ও নিষিদ্ধ। তজ্জন্য, ইহার অন্যতম নাম 'মস্‌জেদোল হেরাম'। পুণ্যক্ষেত্রে ধর্ম্মসাধনায় মুগ্ধ হৃদয় অভূত-পূর্ব্ব ভগবদ্ভক্তিরসে অভিসিঞ্চিত হয় বটে, কিন্তু নিষ্ঠা ও বিনয়-প্রদর্শনে বিন্দুমাত্র ক্ষীণ হৃদয়তার পরিচয় দিলেই তাহার বিপরীত ফল প্রসূত হয়। মহাত্মা ওমরফারুক (রাজিঃ) সেইজন্য হজ্জ-ব্রত সমাপ্তির পরে, হাজিদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের উপদেশ দিতেন। আস্‌হাব ও এমাম-গণ মক্কায় বসতি করা কদাচ অনুকূল বিবেচনা করিতেন না। যদিচ কোরাণশরিফ, প্রসিদ্ধ হাদিস সমূহ, ফেকা ও বয়জাবীর গ্রন্থে মক্কায় বাস করা 'মোস্তাহাব' (শুভদ) বলিয়া বিবৃত আছে; তথাপি আস্‌হাব ও এমামগণের মধ্যে অনেকেই মক্কার মহৎ গৌরব ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলা সুদূরপরাহত ও কঠিন জ্ঞানে, তথায় বাসগৃহের প্রতিষ্ঠা করেন নাই।

মক্কাতীর্থে কাবা মন্দির ব্যতীত অনেক স্থানে হাজিদিগকে উপাসনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। প্রথমতঃ যাত্রিগণ 'এহ্‌রাম' বন্ধন পূর্ব্বক আরফাতে উপনীত হইয়া 'লাব্বায়েক' শব্দে মহাপ্রান্তর প্রতিধ্বনিত করেন,

এবং তথাকার উপাসনা সমাপন করিয়া "মশারেলহারমে" যাত্রা করেন। তথায়, সকলে নিশা যাপন করিয়া, প্রাতঃকালে মস্তক মুণ্ডন ও 'কোরবাণী' করেন। অনন্তর 'ঈদ' উৎসবের প্রত্যুষে তাঁহারা মিনাপ্রান্তরে 'জামরা' ক্রিয়াদি সমাধা করিয়া 'এহ্‌রাম' উন্মোচন করেন; এবং মক্কায় প্রবিষ্ট হইয়া কাবা প্রদক্ষিণ প্রভৃতি কার্য্যে 'হজ্জ' ও 'ওম্‌রা' ব্রত পালন করেন। অবশেষে হজরতের জন্মমন্দির ও বাসগৃহ, পূজনীয়া খদিজাদেবীর সমাধি মন্দির, ধর্ম্মনেতা ও তপস্বীদিগের গোরস্থান এবং 'দারুণ্ খেজরাণ' প্রভৃতি পবিত্র স্থানসমূহে ঈশ্বরের আরাধনা করেন। তন্মধ্যে আমরা নিম্নে কয়েকটী বিশিষ্ট স্থানের পরিচয় দিতেছি।

আবুকবিশ্।

আবুকবিশ্ একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত। ইহার গুহাদেশে আদি পুরুষ আদম (সফিঃ) ও মহাত্মা শীশ-নবীর সমাধি বিদ্যমান আছে; এবং ইহার বিপরীত পার্শ্বে নূরপর্ব্বতের মধ্যভূমিতে সপ্ততি সংখ্যক নবীর সমাধি বিরাজিত। তজ্জন্য হাজিগণ ভক্তিগদগদচিত্তে আবুকবিশের শান্তিরসোৎসারিত ক্রোড়দেশে উপবেশন করিয়া ঈশ্বরের নাম-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

মস্‌জেদে বীয়া।

মক্কার সীমান্তভাগে শীর্ষোক্ত মস্‌জেদটী প্রতিষ্ঠিত। মহাপুরুষ এব্রাহিম (আঃ) কাব্‌স্ নামক স্থানে স্বীয় প্রাণপ্রতিম পুত্র ভগবদ্ভক্ত বালক-এস্মায়িলকে 'কোরবানী' করিতে প্রত্যাদিষ্ট হয়েন। বীয়া প্রান্তরে তিনি পুত্রকে 'কোরবানী' করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে লীলাময় জগদীশ্বর স্বর্গীয় দোম্বা প্রেরণ করিয়া, আপন ভক্তের জীবনরক্ষা করেন। তাহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ দুইটী মস্‌জেদ স্থাপিত হয়। একটী 'মস্‌জেদে কাব্‌স্' ও অপরটী 'মস্‌জেদে বীয়া'। হাজিগণ ইহাতে উপাসনা করেন।

গারে সুর।

কাফেরদিগের পৈশাচিকতায় যে দিবস হজরত মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদিনায় যাইতেছিলেন, সেইদিন অপরাহ্নকালে মহাত্মা আবুবকর (রাজিঃ) ও হজরত সুরগিরির গুহায় রাত্রিযাপনের জন্য আশ্রয় লইয়াছিলেন। ঈশ্বরের অপার মহিমায় তন্মুহূর্ত্তেই গুহা-দ্বার ঊর্ণা জালে সমাচ্ছন্ন হয় এবং কপোত

পারাবত তৎসন্নিহিত একটী কোটরে আসিয়া অবস্থিতি করিতে থাকে। ইতো-মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিগণ তাঁহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া তথায় উপস্থিত হয়; কিন্তু, গুহার প্রবেশ পথে উর্ণা জাল ও পারাবতের নীড় দর্শনে অন্যত্র অনুসন্ধানে বাধ্য হইয়াছিল, তদনন্তর ভীষণ অন্ধকারময় সুর-গহ্বরে তাঁহারা নিরাপদে রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এজন্য, সুরগিরিতে হাজিদিগের ঈশ্বরের মহিমা-কীর্ত্তন করিতে হয়।

গারেমোর্‌সালাত।

আবুজেহেল প্রমুখ দুর্ব্বৃত্তদের অত্যাচারে, যে গিরিগহ্বরে হজরত সবান্ধবে লুক্কায়িত থাকিতেন, তাহা "দারুণ খেজরাণ" নামে বিখ্যাত এবং যে গুহায় প্রচ্ছন্ন ভাবে উপাসনা করিতেন, তাহাই 'গারেমোরসালাত' নামে অভিহিত হয়। প্রতিহিংসায় অন্ধপ্রায় হইয়া আবুজেহেলের কলুষিত হৃদয়ে উত্তরোত্তর নিদারুণ মর্ম্মপীড়া সঞ্জাত হইতেছিল। তজ্জন্য, একদা আজ্ঞাবহ পরিবেষ্টিত যমরাজের ন্যায় দুরাত্মা 'গারেমোরসালাতে' হজরতের প্রাণ সংহার করিতে সমাগত হইয়াছিল; কিন্তু, সহসা একটী বিকট-দর্শন ভুজঙ্গ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া শঙ্কিত হৃদয়ে দ্রুত পলায়ন করিয়াছিল; পুনশ্চ আর কখনও তথায় যায় নাই। সেই গহ্বরস্থিত প্রস্তর খণ্ডে অদ্যাপি হজরতের জানু ও ললাটাদির চিহ্ন দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তজ্জন্য প্রতিবর্ষে ভক্তের নয়ন জলে তাহা সিক্ত হইয়া থাকে।

জমজমকূপ।

প্রেরিত পুরুষ এব্রাহিম (আঃ) স্বীয় সহধর্ম্মিণী হাজেরা ও শিশু পুত্র এস্মাইয়লকে মক্কার জনহীন প্রান্তরে নির্ব্বাসিত করিয়া, সিরিয়াভিমুখে যাত্রা করিলে, তাহার অব্যবহিত পরে, দৈবানুগ্রহে তথায় জমজম্ নামক কূপটী প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার গভীরতা ৩৬ গজ ও পরিসর ৪ গজ মাত্র। ইহার পার্শ্বদেশে দ্বিতীয় আদম স্বরূপ নবীবর নোহের সমাধি বিদ্যমান আছে। জমজম্ কূপ মক্কার একটী অন্যতম পবিত্র স্থান।

ক্রমশঃ।